একক ১১ ❑ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা

গঠন

১১.০ প্রস্তাবনা
১১.১ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা
১১.২ স্বর্ণযুগের সন্ধানে
১১.৩ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা এবং রমেশচন্দ্র দত্ত
১১.৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস এবং পর্ব বিভাজন সমস্যা
১১.৫ অনুশীলনী
১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার (ে ত্রে একে একে এগিয়ে আসেন অ(য়কুমার মৈত্রেয় এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকবৃন্দ। মহারাষ্ট্রে বিচারপতি রানাডে এবং সরদেশাই অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকদের অলোচনা পদ্ধতির পার্থক্য বোঝাতে আমরা প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগের প্রতি উভয়ের মূল্যায়ন পাশাপাশি তুলে ধরেছি। যা এককালে ''স্বর্ণযুগ'' নামে বন্দিত হয়েছিল ইদানীং অনেক ঐতিহাসিক তার অপূর্ণতা ও সামাজিক বৈষম্য ল(্য করেছিল। অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার (ে ত্রে প্রথম পর্বের জাতীয়তাবাদীরা নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত হলেও এদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তাঁরা সরকারী নীতিকে দায়ী করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই মতবাদের একজন শক্তি(শালী প্রবক্ত(া। তাঁর যুক্তি(আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। প্রথম বি(্বযুদ্ধের পর এদেশে সাম্যবাদী ধারণার প্রসারে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অত্যন্ত সচেষ্ট হন। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বে রজনী পাম দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডি. ডি. কোশাম্বি প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় মার্কসবাদের প্রয়োগ আলোচনার একটি নতুন (ে ত্র উন্মুক্ত(করে। প্রসঙ্গতঃ তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১১.১ জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাস রচনা

জাতি গঠনের পিছনে যে সব কারণগুলি প্রধানত উল্লিখিত হয়, তার অন্যতম হল স্বাতন্ত্র্যবোধ। যখন কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে অবস্থানকারী জাতি এবং তার জীবন যাত্রার ভিত্তি রূপে পরিগণিত যৌথ মানব-গোষ্ঠী ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে সমাজ, ভাষা, মত, বি(্বাস প্রভৃতি (ে ত্রে নিজেকে অপরের থেকে বিশিষ্ট বোধ করে, তখন জাতীয়তাবাদের ল(ণ পরিস্ফুট হয়। রেনেসাঁস যুগে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জাতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল স্পেন প্রভৃতি দেশে। বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজে প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্ব

দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের পর জাতীয়তাবাদের ধারণা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। ইউরোপে উনিশ শতক ছিল জাতীয়তাবাদের স্বর্ণ যুগ। কবি, শিল্পী, ভাবুকরা নানাভাবে জাতীয়তাবাদের বন্দনা করেন। গ্রীস অটোমান শাসন থেকে মুক্ত হয়। জার্মানী এবং ইতালিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা জাতীয়তাবাদী শক্তির সাফল্য ঘোষণা করে।

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঐতিহাসিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেবল সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, পরাধীন জাতির কাছে নিজেদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং তাদের মানসিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদীদের একটি প্রচলিত কৌশল। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তা রোধ করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন **রামরাজ** (১৭৯০-১৮৩৩)। তাঞ্জোরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। এই পরিবার ছিল বিজয়নগরের রাজবংশোদ্ভূত। শহরের দুশো ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বৃহদেশ্বর মন্দিরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বালক বয়স থেকে তিনি নিজেকে প্রশ্ন না ক'রে পারেননি— কি ক'রে এর নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল? উত্তর খুঁজতে তিনি দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন শিল্প শাস্ত্র বিষয়ে বহু অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা জন্মায়? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আদলে মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) শহরের ফোর্ট সেন্ট ডেভিড্-এ একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। রামরাজ ঐ প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী জীবনে রামরাজ ব্যাঙ্গালোর শহরের জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ১৮২২ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড তাঁকে সদস্যের মর্যাদা দেয় (Corresponding member)। ১৮৩৪ সালে এই একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী (Essays on the Architecture of the Hindus) প্রকাশিত হয়। রামরাজ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি থেকে ৪৮টি নকসা গ্রন্থভুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থ প্রকাশ পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা এবং মন্দির-ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শক।

প্রাচীন ভারতের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত করেন মারাঠা পণ্ডিত **মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী** (১৮২১-১৮৯২)। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। কাশীর সংস্কৃত কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদ তিনি বহু বছর (১৮৪২-১৮৯০) অলংকৃত করেছিলেন। ১৮৫৮ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে একটি প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য (একাদশ শতক) বিভেদক অন্তরকলনবিদ্যা (Differential Calculus) বিষয়ে অবহিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির রচিত *সূর্যসিদ্ধান্ত* গ্রন্থ প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন বাপুদেব (১৮৬১)। আনুমানিক খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সদস্য পদে বরণ করে। সরকার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারতে পুরাতত্ত্ববিদ্যা চর্চার প্রথম পর্যায়ে যাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাঁদের অন্যতম হলেন **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** (১৮২২-১৮৯১)। ১৮৪৬ সালে তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশ বছর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী কালে তিনি একাদিক্রমে বহু বছর সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। সোসাইটির **বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা** গ্রন্থমালায় ১২টি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে রাজেন্দ্রলালের প্রথম গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur)। ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রধান চারটি গ্রন্থ হল, *The*

Antiquities of Orissa (প্রথম খন্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮০) *Buddha Gaya : The Hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮), দুখন্ডে প্রকাশিত Indo- Aryans (১৮৮১) এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২)। *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খন্ডে উড়িষ্যার প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে ঐ রাজ্যের (তখনও বাংলার অন্তর্গত) বিভিন্ন মন্দির— যেমন ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারকে অবস্থিত — এবং প্রত্নবস্তু স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে আলোচিত। *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল ভারতে স্থাপত্য বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ভারতে স্থাপত্য কর্মের সূচনা গ্রীক প্রভাবের ফল। অশোক স্তম্ভের (খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) পূর্ববর্তী কোনো স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন তখনও পাওয়া যায়নি। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতীয়রা গ্রীকদের সংস্পর্শে এসেছিল। গ্রীকদের কাছ থেকে ভারতীয়রা স্থাপত্য বিদ্যা শিখেছিল,— এই ছিল তখনকার প্রচলিত মত। কিন্তু এই অশোকস্তম্ভই রাজেন্দ্রলালের মতে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই প্রস্তরস্থাপত্যের কথা জানত। অশোক একজন ভারতীয়। বৈদেশিক প্রভাবে তিনি অশোকস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অশোকস্তম্ভ উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাক্ষ্য বহন করে। স্তম্ভটি যথেষ্ট বেড়যুক্ত এবং উচ্চতায় ৪২ ফুট। নির্মাণকার্যের জন্য পাথর বহু দূর থেকে বয়ে আনতে হয়েছে, খাড়া করতে প্রয়োজন হয়েছে বিশেষ নৈপুণ্য। স্তম্ভের অলংকরণ এবং পালিশ বিস্ময়কর। স্থাপত্যকর্মের ঐতিহ্য দেশে বিশেষভাবে গড়ে না উঠলে অশোকের পক্ষে স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হত না। রাজেন্দ্রলালের যুক্তি পণ্ডিত মহল শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

The *Indo-Aryans* গ্রন্থের দুটি খন্ডে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যে তা রাজেন্দ্রলালের বিস্তৃত অধ্যয়ন, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণী মতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতের মন্দির স্থাপত্য এবং জটিল নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি রয়েছে সেকালে সমাজে গো-মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান প্রসঙ্গে প্রবন্ধ। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃতভাষায় লেখা বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের ওপর নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির প্রামাণ্য বিবরণ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* কেবল আয়তন বিচারে নয়, উপাদানের প্রাচুর্যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ, বিশেষজ্ঞ মহলে যা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। তিনজন পণ্ডিতের সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি পাঠ এবং বিষয়বস্তু সংকলন তিনি মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, নিজেও বহু পুঁথির সারসংগ্রহ করেছিলেন। এই কাজে শেষদিকে তাঁর সঙ্গে **পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** (১৮৫৩-১৯৩১) যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধগয়া বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল অন্যান্যদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করলেও তথ্যবিচারে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন,— নির্বিচারে কোন তথ্য গ্রহণ করেননি।

ইংল্যান্ডে প্রচলিত পেনি ম্যাগাজিনের অনুসরণে ১৮৫১ সাল থেকে রাজেন্দ্রলাল *বিবিধার্থ সংগ্রহ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদে পত্রিকার চরিত্র বোঝাতে একে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণী-বিদ্যা এবং শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে মাসিক বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। কেবলমাত্র ভারতের ইতিহাস ভূগোল বা পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে এই পত্রিকায় আরবদের পারস্য বিজয় এবং রাশিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হত। ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার দায়িত্ব রাজেন্দ্রলাল পালন করেছিলেন। উদাহরণত, পত্রিকার দ্বিতীয় খন্ডে হায়দার আলি এবং চতুর্থ খন্ডে টিপু সুলতানের জীবনী বিবৃত হয়। ''শিবাজীর চরিত্র'' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ১৮৬০ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকা ছেলেবেলায় তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ করতো বলে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে জানিয়েছেন। ১৮৬১

খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার তিন বছর পর *রহস্য-সন্দর্ভ* নামে অপর একটি পত্রিকা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন। এটি ন'বছর চলেছিল।

রাজেন্দ্রলালের মনোযোগ কেবল পুরাতত্ত্ব চর্চায় নিবদ্ধ ছিল না। ১৮৭৬ সালে তিনি কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ১৮৭৮ সালে তিনি ঐ সংস্থার সহ-সভাপতি এবং ১৮৮১ সালে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস পরী(ায় অধিক সুযোগ প্রদান এবং ইলবার্ট বিল সমর্থনে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মডারেট। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড, জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি এবং হাঙ্গেরির রয়াল আকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে সভ্যপদে বরণ করে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সরকার তাঁকে ''রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজি শি(ার মাধ্যমে উনিশ শতকে ভারতীয়রা জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে প্র(ো ছিল, ভারতীয়রা এক জাতি গঠন করে কিনা? এমনকি ভারতীয় নেতারাও এ বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত(ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ, **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন *A Nation in the making*। ইংরেজ শাসন ভারতকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বেড়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানে উপযুক্ত(মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাদের সামনে চাকরির সুযোগ ছিল সীমিত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভির পরী(া প্রবর্তিত হলেও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ জন ভারতীয় তাতে নিযুক্ত(হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬। সর্ব ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মোট পদ সংখ্যা তখন ছিল ৯০০। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে সমাজের সর্বস্তরে (োভ দেখা দেয়। ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসকদের তাচ্ছিল্য, বিচারে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি প(পাত ইত্যাদি কারণেও সরকার সমালোচিত হয়। একদিকে ভারতের কুটির ও হস্তশিল্প ধ্বংস এবং অন্যদিকে আধুনিক শিল্প স্থাপনে সরকারের অনীহা অর্থনীতিকে বেহাল করে। কৃষকরা ছিল কর ভারে জর্জর।

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার এই পশ্চাৎপট মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব কেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্র(মশ প্রসার ঘটে। **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬-১৮৯৯) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে **জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভা** প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে **নবগোপাল মিত্র** ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে **হিন্দু মেলা** প্রবর্তন করেন। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব(ে ত্রে জাতীয় উন্নতিতে উৎসাহ দান। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশানাল সোসাইটি, ন্যাশনাল স্কুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল নিজেই এক সময়ে ''ন্যাশনাল'' নামে অভিহিত হতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ **হিন্দু পেট্রিয়ট, বান্ধব, নব্যভারত, বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার** প্রভৃতির নাম করা যায়। **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে **ভারতসভা** প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভিল সার্ভিস পরী(ায় ভারতীয়দের অধিক সুযোগ দেবার দাবিতে তিনি সোচ্চার হন। উত্তর ভারতে ১৮৭৬ সালে তাঁর প্রচারাভিযানে সাড়া জাগে। ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩) কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। ১৮৮৩ সালে ভারতসভার উদ্যোগে **প্রথম জাতীয় সম্মেলন** এবং তার দুবছর পর **জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা** এক নতুন যুগের সূচনা করে। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা প্রবাহে অনুপ্রাণিত বোধ করেন।

বাংলাভাষায় ইতিহাস রচনার ে(ত্রে এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি **রজনীকান্ত গুপ্ত** (১৮৮৯-১৯০০)। হিন্দুমেলা আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রজনীকান্তের লেখা **জয়দেবচরিত** পুরস্কৃত হয়। এটিই তাঁর রচনার প্রথম নির্দশন। এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি *এডুকেশন গেজেট*-এ রাজপুত মারাঠা ও শিখজাতির বীরত্বের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করতে থাকেন। এই রচনাগুলি পরে *আর্যকীর্তি* নামে পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রজনীকান্ত পাণিনির উপর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি কলিকাতা বি(বিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়। ভূমিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **আর. জি. ভাণ্ডারকর** রচনাটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন যে, মৌলিক সমালোচনা ও মন্তব্য- সমন্বিত এই গ্রন্থটি অর্ধশতাব্দীকাল পরেও ছাত্রদের কাছে মূল্য হারায়নি।

রজনীকান্তের ইতিহাসচর্চার ে(ত্র সুবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভারতীয়দের মধ্যে রজনীকান্তই সর্বপ্রথম সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রজনীকান্তের দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফল। গ্রন্থের উপাদানরূপে তিনি বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ ও রচনা, সরকারি কাগজ, লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। সুগভীর দেশপ্রেম, সহানুভূতি ও মানবতাবোধ তাঁর গ্রন্থে সুস্পষ্ট, ভাষা ওজস্বিনী। রজনীকান্তের অন্যান্য রচনার মধ্যে *প্রবন্ধমালা, নব চরিত, ঐতিহাসিক পাঠ,* ভারতকাহিনি, ভীষ্মচরিত, *আমাদের জাতীয়ভাব, আমাদের বি(বিদ্যালয়, ভারত ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রতিভা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিভা গ্রন্থে লেখক উনিশ শতকের পাঁচজন মনীষী-বিদ্যাসাগর, অ(য়কুমার দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের— জীবনী আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩০১ বঙ্গাব্দে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** স্থাপিত হয়। বাঙালির সারস্বত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে শু(থেকেই পরিষদ একটি মর্যাদার স্থান গ্রহণ করে। রজনীকান্ত পরিষদের প্রথম পর্যায়ের অন্যতম সদস্য। *পরিষৎ* পত্রিকার-র তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। পরিষদের অন্যান্য কাজেও তিনি মূল্যবান উপদেশ এবং সময় ও শ্রম অকাতরে ব্যয় করেন। **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** বলেছেন- ''স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথ প্রদর্শক''। (চরিতকথা)

স্বদেশী যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক **অ(য়কুমার মৈত্রেয়** (১৮৬১-১৯৩০)। পেশায় তিনি ছিলেন রাজশাহী জেলার এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁর ইতিহাস সংত্র(ান্ত প্রধান গ্রন্থগুলি হল যথাত্র(মে (১) *সমরসিংহ* (১৮৮৩) (২) সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৮) (৩) *সীতারাম* (১৮৯৮) (৪) *মীরকাসিম* (১৯০৬), (৫) *গৌড়লেখমালা* (১৯১২) এবং (৬) *ফিরিঙ্গি বণিক* (১৯২২)। **অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন** রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অ(য়কুমারের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছেন—''রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন অ(য়কুমার। শুধু তাই নয়, উত্ত(পত্রিকায় সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গ কথা' রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুত্ত(ভাবেই অ(য়কুমারের নামোল্লেখ দেখা যায় অন্তত একবার (ভারতী, ১৩০৫ আষাঢ়, পৃ ৬৬৬(সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)। অতঃপর রবীন্দ্র-সম্পাদিত *'বঙ্গদর্শন'* পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩০৮) থেকেই অ(য়কুমার এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।'' (*প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস সাধনা)*

সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে *সাধনা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েক সংখ্যা এইভাবে প্রকাশ পাবার পর পত্রিকাটি উঠে যায়। তখন

গ্রন্থের বাকি অংশ *ভারতী* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিরাজ চরিত্রে যে কালিমা লেপন করেছেন, অ(য়কুমার নবাবকে তা থেকে অনেকটা মুক্তি(দেন। তবে তিনি কোনও তথ্য গোপন করেননি। এই গ্রন্থ রচনার কাজে তিনি সমকালীন ইংরেজি এবং ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে তথ্য উদ্ধার করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক **ম্যালেসন** মনে করতেন, সিরাজ যত না খল, তার চেয়ে বেশি হতভাগ্য (''Siraju'ddaulah was more unfortunate than wicked.'')। অ(য়কুমার তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি ম্যালেসনের অপর একটি উক্তি(র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (''the name of Siraju'ddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in the tragic drama who did not attempt to deceive.')। অন্ধকূপ হত্যার যে বিবরণ হলওয়েল দিয়েছেন, তা যে বি(্বাসযোগ্য নয় এ কথা অ(য়কুমার প্রথম যুক্তি(তথ্য সহকারে প্রমাণ করেন। কলকাতার ডালহৌসি (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) অঞ্চল থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েলের সা(্যের ওপর নির্ভর করে এই ঘটনার স্মরণে যে স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তা অপসারিত করে। *সিরাজউদ্দৌল্লা* গ্রন্থে অ(য়কুমারের কিছু কিছু বক্ত(ব্য (যেমন, *অন্ধকূপ হত্যা* প্রসঙ্গে) প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিকের নিরপে(তা যে সর্বত্র বজায় থাকেনি রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন—

''গ্রন্থকার যদিও সিরাজ-চরিত্রের কেনো দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম-সহকারে তাহার প(অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সা(্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত(না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বি(্বাসের অন্ধ অন্যায়পরায়নতার দ্বারা পদে পদে (ুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং প(পাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনের মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।'' তবে নির্ভীকতার কারণে অ(য়কুমারকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছেন—''বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।''

সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থের পরিপূরক রূপে অ(য়কুমার মীরকাসিমের রাজত্বকাল বর্ণনা করেন। অত্যন্ত নিপুণভাবে তথ্য বি(ে-ষণ করে এই গ্রন্থেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্ত(ব্য সংশোধন করে। গ্রন্থের অনুত্র(মণিকা অংশে তিনি বলেন ঃ-

''কিরূপে পুরাতন ভাসিয়া গেল, কিরূপেই বা নূতনের অভ্যুদয় হইল, তাহারই কার্যকারণ শৃঙ্খলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

''বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজা-র(ার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন(তাহাই মীরকাসিমের ইতিহাসের প্রধান কথা।''

অ(য়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক **ঐতিহাসিক চিত্র** পত্রিকা প্রকাশ পায়। সম্পাদকীয়তে পত্রিকার উদ্দেশ্য এই বলে বর্ণনা করা হয় ঃ ''নানা ভাষায় লিখিত ভারত ভ্রমণকাহিনি ও ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃতি ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'' রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সূচনাংশ রচনা সমর্থন জ্ঞাপন করেন। **সিরাজউদ্দৌলা** গ্রন্থ প্রকাশের পর যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রে(তে বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর মন্তব্য ঃ ''ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইলে প(পাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু প(পাত অপে(া বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশি বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ লইয়া আর-এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশির লেখনীমুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।'' অ(য়কুমারের আগ্রহে এবং দীঘাপতিয়ার জমিদার কুমার শরৎকুমার রায়ের আনুকূল্যে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে **বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি ভারতবর্ষে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠান। পূর্ব ভারতের ঐতিহ্য সংর(ণে সমিতির অবদান অনস্বীকার্য।

১৯১২ সালে *গৌড়লেখমালা* নামক গ্রন্থে পাল রাজত্বকালের লেখমালাসমূহ অ(য়কুমার সংকলন ও সম্পাদনা করেন। প্রাচীন ইতিহাস পুন(দ্ধারে লেখমালার ঐতিহাসিক গু(ত্ব প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদ আলোচনা আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে **অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন** বলেন— ''বাংলার ইতিহাস সংকলনের প্রথম প্রয়াসের ফল এই গ্রন্থখানি। এই তার বিশেষ গৌরব।'' এই ১৯১২ সালেই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম সম্পাদক **রমাপ্রসাদ চন্দ্র** (১৮৭৩-১৯৪২) সম্পাদিত গ্রন্থ *গৌড়রাজমালা* প্রকাশিত হয়। অ(য়কুমার মৈত্রেয় এক দীর্ঘ ভূমিকায় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং লেখকের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন— ''বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত প্রথম বাংলার ইতিহাস বলে পরিচিত হবার মর্যাদা এই গ্রন্থেরই প্রাপ্য। নিরপে(উদার দৃষ্টিতে দেশের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখার সূত্রপাত হয় এই গ্রন্থ রচনার সময় থেকেই।'' একই সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের মতে, ''সম্ভবত বাংলার ইতিহাস রচনায় নবযুগ প্রবর্তনের (ে ত্রে প্রথম সেনাপতির মর্যাদা অ(য়কুমারেরই প্রাপ্য।''

জাতীয় ভাবে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে **সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮৬৫-১৯৪৮) **ডন সোসাইটি** স্থাপন করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে **জাতীয় শি(া পরিষদ** স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিযুক্ত(হন। **হারানচন্দ্র চাকলাদার** (১৮৭৪-১৯৫৮), **রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়** (১৮৮৪-১৯৬৩), **বিনয়কুমার সরকার** (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রমুখ পরবর্তী কালের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী তাঁদের জীবনের সূচনায় সতীশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ডন সোসাইটির সদস্য হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ। জাতীয় শি(া পরিষদের পরিচালনায় **বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল** প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁরা সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনা করেন। প্রথম বছর এই প্রতিষ্ঠানের অধ্য(ছিলেন অরবিন্দ। নীল চাষিদের দুর্দশা এবং জলপথে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে হারানচন্দ্রের প্রবন্ধ ডন পত্রিকায় ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পরে নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। বিনয়কুমার সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের অতীত ইতিহাসের তুনালমূলক আলোচনার প্রবর্তন করেন। সমাজবিজ্ঞানীরূপে তিনি অধিক পরিচিতি।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *History of Indian Shipping* ১৯১২ সালে প্রকাশিত। সমুদ্রপথে বহির্বি(্বের সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের যোগাযোগ এই গ্রন্থে প্রধানত স্থান পেলেও লেখকের দৃষ্টি মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রসারিত। এই গ্রন্থের অংশবিশেষের ভিত্তিতে লেখক কলকাতা বি(্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেছিলেন। পরে ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা বি(্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতবর্ষের ভৌগলিক অখণ্ডতা সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে উদাহরণ সহযোগে তার আলোচনা করেছেন রাধাকুমুদ **Fundamental Unity of India** গ্রন্থে। ১৯১৪ সালে এই গ্রন্থ প্রথম লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত লেবার দলনেতা **জেমস র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড** *(James Ramsay MacDonald, 1866-1937)* গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রে(তে তিনি বলেন ঃ ''Dr. Mookerjee writes only of history, but it is a history

which we read with political thoughts in our mind." জাতীয়তাবাদের ধারণা যে ভারতীয় চিন্তায় নিহিত, পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা নয়, *Nationalism in Hindu Culture (1921)* গ্রন্থে রাধাকুমুদ তা বোঝাবার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের বহু নির্দশন তিনি উপস্থিত করেছেন *Local Government in Ancient India* গ্রন্থে। ১৯১৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারত স্বায়ত্ত শাসনের দাবি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের বছরগুলিতে **হোম (ল** আন্দোলনের প(থেকে বিশেষভাবে করা হয়। ভারতের ইতিহাস থেকে এই দাবির সমর্থনে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত(গ্রন্থে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত *Corporate Life in Ancient India* (1922) গ্রন্থে এই বক্ত(ব্য সমর্থিত হয়। প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক রূপরেখা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কতকগুলি গ্রন্থে বিবৃত করেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁরা *Ancient India* গ্রন্থের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে(তাঁর এই ধরনের উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেন। মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধিতা করে তিনি পরিণত বয়সে রাজনীতিতে যোগ দেন।

প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৮৬-১৯৩১) স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পিতা মতিলাল ছিলেন বহরমপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শি(ার সুযোগ তাঁর হয়। **রাজেন্দ্রপ্রসাদ** (১৮৮৪-১৯৬৩) এবং **শরৎচন্দ্র বসুর** (১৮৮৯-১৯৫০) মতো পরবর্তীকালে বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতারা ছিলেন তাঁর সহপাঠী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নির্দেশে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই লখ্নৌ যাদুঘরে র(িত প্রত্নবস্তুগুলির তালিকা প্রণয়নের কাজে রাখালদাস অংশগ্রহণ করেন।

স্নাতকোত্তর পরী(ায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১০ সালে রাখালদাস ভারতীয় যাদুঘরে *Archaeological Assistant* এর পদে বৃত হন। এখানেই তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ থিয়োডোর ব্লকের সংস্পর্শে আসেন। ব্লকের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক, বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে, পরিচিত হন। ১৯১১ সালে রাখালদাস *Archaeological Survey of India*-তে সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হন। একই সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি *Archaeological Survey of India*-র পশ্চিম ভারতীয় শাখার এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত পূর্ব ভারতীয় শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান-রূপে মণীন্দ্র নন্দী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে অকালে মৃত্যুবরণের আগে পর্যন্ত তিনি সেই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

রাখালদাসের প্রধান কৃতিত্ব ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হলো যে, ভারতীয় সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম অন্যান্য সভ্যতাগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালাবার জন্য সরকার আরো উদারভাবে অর্থ মঞ্জুর করেন। এরপর ১৯২৫-২৬ সালে উত্তরবঙ্গের রাজশাহি জেলার পাহাড়পুরে রাখালদাসের নেতৃত্বে খননকার্য শু(হয়। ফলে মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথম পর্বে সোমপুরে নির্মিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ রূপ, ভূমি-নকশা ও মন্দিরের অলঙ্করণের বৈচিত্র্য সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়ে।

লেখতত্ত্ব, প্রাচীন লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাবিদ্যা, প্রাচীন মূর্তি এবং শিল্পতত্ত্ববিচার প্রভৃতি ইতিহাসের অন্যান্য শাখাতেও রাখালদাস বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লেখতত্ত্ব-বিশারদ হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯০৯ সালে *Journal of the Asiatic Society of Bengal* পত্রিকায় লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন সম্পাদনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তিনি আরো অনেক অভিলেখ সম্পাদনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ল(ণ সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন, বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, ভোজবর্মনের বেলবা তাম্রশাসন এবং মালয় থেকে প্রাপ্ত মহানাবিক বুধগুপ্তের শীলমোহর লিপি। লেখতত্ত্বের ওপর রাখালদাসের জ্ঞান লিপিতত্ত্বে গভীর বুৎপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এ বিষয়ে দুটো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ (১) Origin of the Bengali Script (১৯১৯) এবং (২) Palaeography of the Hathigumpha and Nanaghat Inscriptions (১৯২৯)। *প্রাচীন মুদ্রা* নামে সাধারণের জন্য রাখালদাস বাংলায় একটি সহজবোধ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

শিল্পকলা ও মূর্তিতত্ত্বের উপাদানসমূহের ব্যবহারেও রাখালদাস কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। মধ্যপ্রদেশের ভূমারা, উড়িষ্যার গন্ধারদি প্রভৃতি জায়গার মন্দিরগুলির মতো গু(ত্বপূর্ণ বহু স্মৃতিসৌধ বা স্তম্ভ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তিনি সরজমিনে লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী অঞ্চলে হৈহয় রাজাদের আমলে নির্মিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়নের ফসল *Haihayas of Tripuri and their Monuments* (১৯২২ সালে লিখিত, কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১-এ প্রকাশিত)। তাঁর *Temple of Bhumara* (১৯১৯) গ্রন্থে কিভাবে একটি মন্দিরকে আঙ্গিকের বিভিন্ন দিক থেকে বি(-ষণ করা যায় রাখালদাস তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। *Bas reliefs of Badami* (১৯২৮)-তে পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের বাদামী অঞ্চলের গুহাগুলির সমৃদ্ধ ভাস্কর্য-নিদর্শনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। রাখালদাসের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ বোধ হয় তাঁর *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* নামীয় মহাগ্রন্থ (তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত)। প্রধানত বাংলা ও বিহারে পাল-সেন রাজাদের আমলের সংখ্যাবহুল এবং মনোজ্ঞ ভাস্কর্যকর্ম এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত্র(মে উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নিদর্শন লেখকের নিজের আবিষ্কার।

রাখালদাসের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে *Palas of Bengal* (১৯১৫), *Age of the Imperial Guptas* (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত), দুখণ্ডে *History of Orissa* (১৯৩০-৩১) এবং *Pre-historic Ancient and Hindu India* (মৃত্যুর পরে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত)।

ইতিহাস রচনায় নিরপে(তার আদর্শে বি(াসী হলেও স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমের প্রতি রাখালদাসের অনুরাগের নিদর্শন তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর গ্রন্থে ভারত-আত্র(মণকারী শক ও কুষাণদের বিজেতা হিসাবে গুপ্ত রাজাদের ভূয়সী প্রশংসা মেলে। স্কন্দগুপ্তকে তিনি যথার্থ দেশপ্রেমিকের মর্যাদা জানিয়েছেন। অশোকের অহিংসা নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল বলে তিনি মনে করতেন।

রাখালদাস আটটি উপন্যাস রচনা করেন, যার মধ্যে সাতটি ইতিহাসাশ্রয়ী। তাঁর দেশাত্ববোধ এখানে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে *ক(ণা* উপন্যাসে যেখানে স্কন্দগুপ্ত নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র অগ্নিগুপ্ত হূণদের বি(দ্ধে দেশের স্বাধীনতা র(ার জন্যে মৃত্যুবরণ করেন। দ(িণ ভারতীয়দের প্রতি রাখালদাসের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান আত্র(মণকারীদের দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেছেন। উত্তর ভারতের হিন্দুদের সমালোচনায় তিনি বলেন, 'ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার অভাব তাদের পতনের অন্যতম কারণ। *Pre-historic Ancient and Hindu India* গ্রন্থে তিনি বলেছেন তাদের মধ্যে

বিজয়নগরের কৃষ(দেবরায় বা হরিহরের মতো দ(িণ ভারতীয় দ্রাবিড়ী হিন্দুদের গুণাবলির অভাব ঘটেছিল।'

বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি রাখালদাসের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উল্লেখ ছাড়া এই আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। শশাঙ্ক এবং ধর্মপালকে নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের পরাজয়ের ফলেই বাণভট্ট ও য়ুয়ান চোয়াঙ তাঁর সমালোচনা করেন। শশাঙ্কের বি(দ্ধে তাঁদের মন্তব্যগুলি তিনি তাই গ্রহণ করেননি। বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি রাখালদাসের অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে *Eastern Indian School of Sculpture* গ্রন্থে তাঁর এই মন্তব্যে ঃ- অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের পূর্বস্থ প্রদেশসমূহে শিল্পকৃতি চমৎকারিত্ব, উৎকর্ষ ও ব্যাপ্তির বিচারে এমন এক স্তরে উঠেছিল, যার কাছাকাছি উত্তর ও দ(িণের অন্যান্য প্রদেশগুলি পৌঁছতে পারেনি। এ ব্যাপারে পাল ও সেন-বংশীয় রাজারা অন্য সবাকে শ্রেষ্ঠতায় অতিত্র(ম করেছিল।

পশ্চিম ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ধারা প্রবর্তন করেন **মহাদেও গোবিন্দ রানাডে** (১৮৪২-১৯০১) এবং **কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ** (১৮০৫-১৮৯৩)। তেলাঙের প্রতিভা যৌবনে প্রকাশ পেয়েছিল। বাল্মিকীর রামায়ণ গ্রন্থের আখ্যানভাগ মহাকবি হোমারের ইলিয়াড থেকে নেওয়া— এমন একটি তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে জন্ম নিয়েছিল। উভয় কাব্যে রাজমহিষীর অপহরণ এবং পরিণামে একটি সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা থেকে সম্ভবত এই ধারণার উৎপত্তি। তেলাঙ একটি প্রবন্ধে এই ভ্রম নিরসন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। মারাঠীদের মধ্যে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ লিখে রাখার চল ছিল। (বাখর) ১৮৯০ সালে তেলাঙ এবং রানাডে সরকারের কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রাথমিক তথ্যোপাদান পরী(া করার সুযোগ লাভ করেন। এর ভিত্তিতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রানাডের বিখ্যাত গ্রন্থ *Rise of the Maratha Power*। মারাঠারা গোড়ায় লুটেরা এবং শিবাজি দস্যুদলনায়ক ছিলেন বলে ইংরেজ লেখকদের রচনায় অপবাদ দেওয়া হত। রানাডে এই কলঙ্ক মোচন করেন। মারাঠা জাতি গঠনে একনাথ, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের অবদান তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শিবাজির নেতৃত্বগুণ অকুণ্ঠে স্বীকার করলেও মারাঠা শক্তি(র অভ্যুত্থানের পিছনে জাতিগত ঐক্যের মনোভাব প্রধান প্রেরণা বলে তিনি মনে করতেন। মোগলদের হাত থেকে ইংরেজরা (মতা ছিনিয়ে নিয়েছে, এই ধারণার তিনি বিরোধিতা করেন। মোগলদের পর মারাঠারা এদেশে (মতা বিস্তার করেছিল। (মতার লড়াইয়ে তারাই ছিল ইংরেজদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। *Rise of the Maratha Power* গ্রন্থে রানাডে মারাঠাদের গৌরবের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্রের অন্যতম জাতীয়বাদী ঐতিহাসিক **গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই** (১৮৬৫-১৯৫৯)। বরোদার রাজদরবারে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। সর্বদাই তিনি সেখানে কোন-না-কোন গু(ত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুবরাজদের শি(ার্থে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি মারাঠী ভাষায় বারটি গ্রন্থ (রিয়াসৎ) রচনা করেন। এর প্রধান অংশ ছিল মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত। ১৯২৬ সালে Main Currents of Maratha History নামে একটি গ্রন্থে সরদেশাই প্রথম মারাঠাদের ইতিহাস সং(েপে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি তিন খণ্ডে লেখা New History of the Marathas (১৯৪৬-৪৮)। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে *(Shivaji and his line)* মারাঠাদের উৎপত্তি থেকে দা(িণাত্যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মারাঠাদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের রাজ্যবিস্তারর যুগ, *Expansion of the Maratha Power*। পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে এই খণ্ডের সমাপ্তি। শেষ পর্যায়ে *(Sunset over Maharashtra)* মারাঠা শক্তি(র পতনের কারণ আলোচনা করেছেন সরদেশাই। এখানে উল্লেখ্য, মারাঠী এবং ইংরিজি ভাষায় মৌলিক তথ্যোপদান পরী(া করা কেবল তাঁর প(ে সম্ভব ছিল। ফারসী কিংবা ইংরেজী ব্যতীত অন্য ইউরোপীয় ভাষায়

রচিত তথ্যের জন্যে তাঁকে অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হত। মারাঠা ইতিহাসের বহু মূল্যবান নথি সরদেশাই সম্পাদনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে মারাঠী ভাষায় ঐতিহাসিক পত্র ব্যবহার (১৯৩৩)। পেশোয়াদের দপ্তরে র(িত কাগজপত্রের সংকলন তিনি ৪৫ খণ্ডে প্রকাশ করেন (Selections from the Peshwa Daftar)। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট-দের চিঠিপত্রের সংকলন Poona Residency Correspondence তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এগুলির মূল্য কম নয়। **আচার্য যদুনাথ সরকার** (১৮৭০-১৯৫৮) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। গবেষণা-সূত্রে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, যদিও সর্ববিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ যদুনাথ মনে করতেন পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) অহমদ শাহ আবদালির কাছে মারাঠাদের পরাজয় ছিল একটি জাতীয় বিপর্যয়। কিন্তু সরদেশাই তা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর বক্ত(ব্যের সমর্থনে ছিলেন না। এই ঘটনার অল্পকাল পরে পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ে মারাঠা বাহিনীর উত্তর ভারত অভিযানে এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন। সরদেশাইয়ের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য মারাঠা জাতির প্রতি ভালোবাসা। মারাঠাদের প(অবলম্বন করে তিনি তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন। মারাঠাদের রাজনৈতিক শক্তি(স্থায়ী না হওয়ার ব্যর্থতায় দুঃখ শোক লেখায় প্রকাশ পায়।

১১.২ স্বর্ণযুগের সন্ধানে

বাস্তবের সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে মানুষ অতীতের দিকে তাকাতে ভালোবাসে। যদি সে অতীত হয় এমন যা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক (ে ত্রে মহান, তবে তাকে নিয়ে গর্ব করা হয়। ইতিহাসে তাকে আমরা বলি স্বর্ণযুগ। এমনই বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে পনের শতকের ইউরোপ তাকিয়েছিল প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের দিকে। রেনেসাঁস যুগে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে এই দুই ধ্রুপদী সংস্কৃতির অবদান অপরিসীম। মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ তাদের এই মহান উত্তরাধিকারের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। কন্সটান্টিনোপল শহরে সঞ্চিত এই জ্ঞান-ভাণ্ডার ইউরোপীয়দের সামনে উন্মুক্ত(হয়েছিল পনের শতকের মধ্যভাগে, কৃষ(সাগর তীরে অবস্থিত ঐ শহর ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা অধিকার করার পর। গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপ নিজেকে আবিষ্কার করে। মধ্যবর্তী শতকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের আখ্যা লাভ করে (Dark Ages)। গ্রীক ও লাতিন ভাষাজ্ঞান ব্যতীত মানবিকী বিদ্যা শি(া সম্পূর্ণ হতে পারে বলে ইউরোপীয়রা মনে করত না। আঠার শতক পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। ভারততত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম যুগের প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা এমন এক সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করেছিলেন যার মাহাত্ম্য ইউরোপীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের সাধনার কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ)

বিশ শতকের শু(থেকে ভারতীয় ইতিহাসে ''স্বর্ণযুগ'' বলতে আমরা সাধারণত গুপ্ত যুগকেই বুঝি। (''For historians writing in the early twentieth century, the 'golden age' had to be a utopia set in the distant past, and the period chosen by those woring on the early history of India was one in which Hindu culture came to be firmly established.''- A History of India, **Romila Thapar)**। ভিনসেন্ট স্মিথ,— যিনি সমুদ্রগুপ্তকে ভারতীয় নেপোলিয়ন (''Indian Napoleon'') বলেছিলেন,— গুপ্ত যুগকে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় এবং স্টুয়ার্ট যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন (''a time of exceptional intellectual activity in many fields–a time not unworthy of comparison with the Elizabethan and the Stuart period of England.'' Smith, *Early History of India)*। **বার্নেট** গুপ্তযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিস-এর যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুপ্ত যুগ সংত্র(ান্ত আলোচনায় এই ধারণাই

অসাধারণত অনুস্যূত হয়েছে।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। গুপ্ত সম্রাটরা কেবল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কবি ও সুপণ্ডিত। সমুদ্রগুপ্ত **'কবিরাজ'** উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সভাকবি হরিসেণের এলাহাবাদ-প্রশস্তি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এ যুগে পুরাণসমূহ রচিত ও স্মৃতিশাস্ত্র সংকলিত হয়। সম্ভবত মহাভারত এই সময় নতুন করে পরিমার্জিত হয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছিলেন। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটির* এবং বিশাখাদত্তের *মুদ্রারা(স* নাটক এ যুগের রচনা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিত্র(মাদিত্য ভিন্ন না হলে মহাকবি কালিদাস একালেই তাঁর রচনা প্রণয়ন করেন। তাঁর *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, রঘুবংশম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মেঘদূতম,* প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। দর্শন চিন্তার (ে ত্রে পি(লস্বামিনের *ন্যায়সূত্র,* বসবন্ধুর *পরমার্থসপ্ততি,* দিঙ-নাগাচার্যের *প্রমাণ সমুচয়* এই যুগের মূল্যবান ফসল। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের রূপকার ছিলেন বিষু(শর্মা, দণ্ডি ও দশকুমার।

গুপ্তযুগে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন (৪৭৬ খ্রিঃ) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে, তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সুর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। **সূর্যসিদ্ধান্ত** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এ যুগের অন্যান্য জোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **বরাহমিহির** ও **ব্রহ্মগুপ্ত।** দশমিকের ব্যবহার গুপ্ত যুগেই প্রচলিত হয়। সুশ্রুত ছিলেন একালের অসাধারণ শল্য চিকিৎসক। অনেকে মনে করেন, কিংবদন্তী **ধন্বন্তরীর** আবির্ভাব এই সময়ে ঘটেছিল। দিল্লির লৌহস্তম্ভ এ যুগের ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। দীর্ঘকাল উন্মুক্ত(স্থানে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্তম্ভগাত্রে এখনও মরচে ধরে নি। গুপ্তযুগের অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও তামার মূর্তি পাওয়া গেছে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পে গুপ্তযুগের অবদান অবিস্মরণীয়। গুহামন্দির নির্মাণে গুপ্তযুগের শিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন(অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইট-পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ গুপ্ত যুগে শু(হয়। মণিনাগের মন্দির এবং দেওঘরের দশাবতার মন্দিরের শিল্পকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **স্যার পার্সিব ব্রাউনের** মতে, দেওঘরের দশাবতার মন্দিরটি গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন। **ভিনসেন্ট স্মিথ** বলেন, ''স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা— এই তিনটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত(শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল গুপ্তযুগে।'' **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে গুপ্তভাস্কর্য আ(রিকভাবেই ভারতীয় ও ধ্রুপদী। সাঁচী, সারনাথ ও মথুরায় প্রাপ্ত বুদ্ধিমূর্তি এ যুগের ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। সারনাথের বুদ্ধমূর্তির মধ্যে এক অপূর্ব প্রশান্তির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের মূর্তিগুলির অঙ্গ-সংস্থাপনের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। অজন্তা গুহার প্রাচীর গাত্রে যে-সব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, সেগুলি রঙে, রেখায় ও ভাব-মাহাত্ম্যে সর্বকালের মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। ''মাতা ও পুত্র'', ''হরিণ চতুষ্টয়'', ''বোধিসত্ত্ব চত্র(পাণি'' ইত্যাদি গুহাচিত্রগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। বাঘগুহার প্রাচীর চিত্রগুলিও অনবদ্য।

গুপ্ত যুগকে ''স্বর্ণযুগ'' বলা কতখানি সঙ্গত এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা (ে ত্র বিশেষে সংশয় প্রকাশ করেছেন। **অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম** বলেছেন পূর্ব ও পশ্চিমদেশে বহু ঐতিহাসিক অতীত ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সন্ধান করেছেন। কিন্তু নিরপে(ভাবে অতীতের পর্যালোচনা করে মানুষ পারে ভবিষ্যতকে আরও উন্নত করে তুলতে। (''Too many historians in East and West alike have looked back to vanished golden ages, and tried to build Utopias in the past; but man can only create a better future for himself by looking the past squarely in the face.''–A. L. Basham, *Foreword* to the book *Economic life in Northern India in the Gupta Period* by S.K. Maity) অনুরূপভাবে অধ্যাপক **দ্বিজেন্দ্র**

নারায়ণ ঝা মন্তব্য করেন,— উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের কাছে ইতিহাসের সব যুগই স্বর্ণময়, সাধারণ মানুষের কাছে নয়। জনসাধারণের স্বর্ণযুগ, অতীতে নয়, ভবিষ্যতে নিহিত। (''for the upper classes all periods in history have been golden; for the masses none. The truly golden age of the people does not lie in the past, but in the future.''–D. N. Jha, *Ancient India : An Introductory Outline)* প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, গুপ্ত যুগে হিন্দু সভ্যতার চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল, এমন ভাবা ভুল। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে এযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চোখে পড়ে যথাত্র(মে অজন্তার গুহাভ্যন্তরে এবং সারনাথে। কিন্তু উভয় (ে ত্রেই শিল্পকর্ম বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পাঁচটি প্রচলিত শাখার সং(িপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি গ্রীক পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সা(্য বহন করে। জ্যোতিষ চর্চার প্রতি বরাহমিহিরের ঝোঁক বিজ্ঞানমনস্কতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। গুপ্ত যুগের অনেক আগে থেকেই পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। গুপ্ত যুগে তা বর্তমান রূপ লাভ করে। গুপ্ত সম্রাটরা— বিশেষত সমুদ্রগুপ্ত— তিনজেরাই শিলালেখে নিজেদের প্রশস্তি করেছেন। সংস্কৃত কাব্য বা নাটকে গুপ্ত সম্রাটদের গুণ কীর্তন করা হয়নি। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে শুঙ্গ রাজাদের কথা প্রচার করা হয়েছে, বিশাখাদত্তের *মুদ্রারা(স*-এ প্রধান চরিত্র চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। পুরাণে গুপ্ত রাজাদের ''ম্লোচ্ছ প্রায়'' বলা হয়েছে। এর থেকে আমরা সমাজে তাদের নিচুতে অবস্থানের কথা বুঝতে পারি।

গুপ্ত যুগের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এ সময়ে জাতিভেদ এবং বর্ণব্যবস্থাপ্রথা পূর্বের তুলনায় অধিক জটিলতা প্রাপ্ত হয়। নাটকের ভাষা ব্যবহারে সামাজিক বৈষম্য প্রকাশ পায়। অভিজাতদের ভাষা সংস্কৃত। প্রাকৃত ছিল সাধারণের ভাষা। সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে পু(ষ শাষিত। স্ত্রীলোক এবং সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থার অবনতি হয়। ফা-হিয়েন চণ্ডালদের অবস্থার অবনতি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। ভূমিদাস প্রথার সূচনা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ় ছিল বলা যায় না। গুপ্ত যুগে আর্থিক সমৃদ্ধি আগের মতো ছিল না। উজ্জয়িনী কিংবা কনৌজের মতো গুপ্ত যুগের প্রসিদ্ধ শহরগুলির বৈভব ছিল মৌর্যদের রাজধানী পাটলিপুত্র অপে(া কম। শিল্প-সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। লোক শিল্পের নিদর্শন যেমন মাটির মূর্তি কিংবা বাসন কম সংখ্যায় দেখা যায়। স্বর্ণমুদ্রার প্রাচুর্য থাকলেও রৌপ্যমুদ্রা, দিনার প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি দেখা যায়।

ওপরের সমালোচনাগুলি কতখানি যথার্থ সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে ''হিন্দু যুগ'' বলে চিহ্নি(ত করা ভুল হবে। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়গুলির অবদান ছিল গু(ত্বপূর্ণ। সভ্যতার ত্র(মবিকাশকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু, ইতিহাসের কোনও পর্বকে আমরা যখন ''স্বর্ণযুগ'' আখ্যায় ভূষিত করি, তখন তার কতকগুলি অতুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়। গুপ্ত যুগের শিল্প-সাহিত্য সে মর্যাদা বহন করে। যা প্রকৃতই শ্রদ্ধেয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেবলমাত্র নেতিবাচক দিকগুলি যদি আমরা তুলে ধরি, তবে বিচারে ভারসাম্য বজায় থাকে না। গুপ্ত যুগের মূল্যায়নে সে ভুল যেন আমরা না করি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এখনও পৃথিবী থেকে দূর হয়নি। গুপ্তযুগে এরূপ ভেদ ছিল না, এমন দাবি কেউ করবেন না। কিন্তু সে সময়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিস্তার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিতর্কিত। (পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ছেদ পড়লেও দ(িণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় নতুন বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত(হয়। সামগ্রিকভাবে, বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল বলা যাবে না। গুপ্ত যুগে নগরের অব(য় প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কেও একই কথা প্রচ্ছেদ্য। পাটলিপুত্র পূর্বের গৌরব হারালেও কনৌজ এবং থানে(ের গু(ত্ব অর্জন করে। কাশী এবং মথুরা বস্ত্র ব্যবসায় এবং মন্দির নগরী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়। হরিদ্বার ছিল তীর্থস্থল। গুপ্তযুগের নিদর্শন হিসাবে তামা ও লোহার বহু

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গৃহকর্মে নলযুক্ত(পাত্র (spouted pottery) ব্যবহৃত হত। **রমিলা থাপার** মনে করেন, এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব গুপ্ত যুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে, এই সভ্যতার ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা ল(ণীয়। কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই তার বিকাশ ঘটে। বিন্ধ্য পাহাড়ের দ(ণে সভ্যতার অধিক বিকাশের জন্য আমাদের গুপ্ত-পরবর্তী যুগের জন্য অপে(া করতে হয়।

১১.৩ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা এবং রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম যুগের জাতীয়াতাবাদীদের অন্যতম অবদান বোধহয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা। ওপনিবেশিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনভাবে এ দেশের রূপান্তর ঘটানো হচ্ছিল বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন ঃ- (১) এদেশকে ব্রিটেনের কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত করা, (২) এদেশকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজাররূপে ব্যবহার করা, এবং (৩) ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের (ত্রে হিসাবে এ দেশকে কাজে লাগানো। একদিকে দেশের পুরনো হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন এবং অন্যদিকে আধুনিক শিল্পবিকাশে সরকারের অনীহার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতের রেলপথ, চাবাগিচা, শিল্প ইত্যাদির (ত্রে লগ্নি করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি আমদানি করা হচ্ছিল, তাঁরা তার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে, গ্যারান্টি বা ঋণের ব্যবস্থা করে কিংবা সরকারি অর্থপুষ্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য ক(ক। বিদেশে ধারের ব্যবস্থা করে দেশী শিল্পকে সে মূলধন ধার দেওয়াও সরকারের প(সম্ভব ছিল। ইস্পাত, খনি প্রভৃতি শিল্প(ত্রে প্রবেশ করার সামর্থ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের তখনো হয় নি। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নতির স্বার্থে কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন সরকার উদ্যোগী হয়ে এ-সব (ত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তুলুন। শিল্প-বাণিজ্য সংত্র(ান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ও প্রযুক্তি(বিদ্যার যথাযথ সম্প্রসারণও তাঁরা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতির স্বার্থে কংগ্রেসী নেতারা স্বদেশি ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এর ফলে অনেক স্বদেশি দোকান খোলা হয়েছিল। **গণেশ বাসুদেব** যোশি যখন ১৮৭৭ সালের রাজদরবার পরিদর্শন করেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নিখুঁত হাতে বোনা খাদি। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে একটি বড়ো স্বদেশি আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছিল। ছাত্রেরা সেখানে প্রকাশ্যে বিদেশি কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করে। ভারতে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক রহিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন, জাতীয়তাবাদীরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তার বি(দ্ধে আন্দোলন করে। বস্ত্রশিল্পের উপর কর চাপানোর নীতির বি(দ্ধে ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন চলে। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ কী তা ভারতবাসীর কাছে এই আন্দোলনের ফলে ধরা পড়েছিল এবং দেশব্যাসী জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরাও আরও কতকগুলি দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভূমিরাজস্বের অত্যাধিক চড়া হার কমিয়ে আনা হয় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কৃষিব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার চাষীদের যাতে সুলভে ঋণ দেয় সে জন্য তাঁরা সরব হয়েছিলেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁরা সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন। আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসম্পর্কের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে ব্রিটিশ সরকার আগ্রহী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। আন্দোলনের আর একটি ল(্য ছিল চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন। তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থা ও সরকারি ব্যয়ের (ত্রে তাঁরা চেয়েছিলেন আমূল পরিবর্তন। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বিশেষ করে যে-সব করের বোঝা বইতে হত (যেমন লবণ শুল্ক)

সেগুলি তুলে দেওয়ার দাবি তারা জানান।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রকৃতি বোঝাতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান উদ্ধার করে তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন কিভাবে ভারতের অর্থসম্পদ ও মূলধনের একটি বড়ো অংশ নানা পথে এদেশ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। এজন্য তাঁরা ''সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব'' বা ''ড্রেন থিয়োরি'' অবলম্বন করেন। একটি বড়ো অংশ নানা পথে এদেশ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। **দাদাভাই নৌরজী** (১৮২৫-১৯১৭) তাঁর *Poverty and Un-British Rule in India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে এদেশে অসংখ্য ব্রিটিশ কর্মচারীর বেতন ও অবসরবৃত্তি এবং ব্রিটিশ পুঁজির লভ্যাংশ সুদ সমেত প্রতি বছর ৩০,০০০,০০০ বা ৪০,০০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ সম্পদ ভারত থেকে ব্রিটেনে চলে যায় অথচ অসংখ্য ভারতবাসী অনাহারে মারা যায়।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্ত(া **রমেশচন্দ্র দত্ত** (১৮৮৪-১৯০৯)। এই প্রসঙ্গে অন্য যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন রানাডে জি. ভি. যোশী, জি. এস আইয়ার প্রমুখ। দাদাভাই নৌরজীর বক্ত(ব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮৬৯ সালে রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরী(ায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ সালে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে তিনি বিলেতে যান। লন্ডন বি(বিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করেন। চাকরি জীবনের শু(থেকেই তিনি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ শু(হলে ARCYDAE ছদ্মনামে তিনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকার প্রজাস্বত্ব বিষয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনা করেন। *The Peasantry of Bengal* গ্রন্থে কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। ব্রিটেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বি(েষণ রয়েছে তাঁর *England and India–A Record of Progress during Hundred years* নামক গ্রন্থে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির (েত্রে রমেশচন্দ্র ছিলেন সেকালের অন্য নেতাদের মতো মডারেট। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসের লখ্নৌ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রধানত জমিতে অত্যধিক করের বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর *Open Letter to Lord Curzon on Famines and Assessments in India* নামক গ্রন্থে সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্বের অপব্যবহারের সমালোচনা করেন। রমেশচন্দ্রের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস *(Economic History of India)*। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রথম খণ্ডের (১৯০২) বিচার্য! দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের অর্থনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

চাকরি সূত্রে রমেশচন্দ্র পঁচিশ বছরের অধিক সময় বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিভ্র(মণ করেন। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর অক্লান্ত অনুসন্ধান। তিনি প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবরণী (Parliamentary Paper), বিভিন্ন সরকারি কমিশনের বিবরণ এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মন্তব্য থেকে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র তিনি বিশেষ ব্যবহার করেননি। প্রথম খণ্ডের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে কোম্পানি আমলে ভারতে ভূমি ব্যবস্থার আলোচনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাংলায় ভূমি রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারিত, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ এখানে কম। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে ত্রিশ বছর অন্তর জমির নতুন বন্দোবস্ত হয়, ভূমি রাজস্বের হার অত্যধিক এবং অনিশ্চিত। ''অর্ধ ভূমিকরের নিয়ম'' (Half Rental Rule) শুধু কাগজের পত্রে(বাস্তব অবস্থা এই যে নতুন নতুন কর চাপিয়ে ''কৃষক''-এর কাছ থেকে বেশি কর আদায় করা হয়। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনের ''ল্যান্ড রেজলিউশন'' উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জমিদারের উপর ভূমিকর গড় আয়ের অর্ধেকের থেকে কম(অযোধ্যায় ভূমিকর গড় আয়ের শতকরা ৪৭ অংশ; উড়িষ্যায়

তা ৫০ ভাগের কিছু বেশি। শহরে ব্রিটিশ বণিকদের বিরোধিতার কারণে ব্যবসায়ীদের উপর কর বসান হয়নি—''কৃষকদের'' উপর করের বোঝা চাপানো হয়েছে। ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটির (Dufferin Enquiry Committee, 1888) বিবরণী থেকে তথ্য উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র ভারতবাসীর, বিশেষত কৃষক সমাজের, চরম দারিদ্র্যের নির্দেশ করেছিলেন। রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় কৃষক শ্রেণী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত(ছিল। গরীব কৃষকরা সংখ্যাধিক। তাদের জীবন ধারণের মান খুব নিচু। গ্রামের মানুষদের একটি বড় অংশ জমিহীন (ে তমজুর। এটোয়ার কলেক্টর লিখেছিলেন, (ে তমজুরের মাসিক আয় তিন টাকার বেশি নয়। গরীব কৃষক ও (ে তমজুর ঋণে নিমজ্জিত। ব্রিটিশ শিল্পের জন্যে কাঁচা মালের উৎপাদন এবং ভারতে ব্রিটিশ পণ্য বিত্র(য় রমেশচন্দ্রের মতে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক নীতির দ্বিবিধ ল(্য। এর ফলে ভারতে প্রাচীন শিল্পগুলি ধ্বংস হয়। ল(ল(কারিগর বাস্তুচ্যুত হয়ে কৃষিতে সংস্থান খোঁজে। জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অতীতে ভারতের যেসব শিল্পের দেশে-বিদেশে কদর ছিল, কোম্পানির আমলে সেগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং অবশিল্পায়ন প্রত্রি(য়া (de-industrialisation) রমেশচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেন।

বার্ক-এর বিখ্যাত Ninth Report অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র ''নির্গম তত্ত্ব'' ব্যাখ্যা করেন। বাংলার রাজস্বের একটি অংশ ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্য কেনার কাজে ব্যয় হয় (investment)। এইভাবে ভারতের সম্পদ বাইরে চলে যায়। বিনিময়ে ভারত কিছু পায় না। ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ রমেশচন্দ্রের মতে এই সম্পদ নিষ্কাসনকে দায়ী করেন। ১৭৯২ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে মোট উদ্বৃত্ত রাজস্ব ছিল ৪৯ মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু এই অর্থ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে কোম্পানির অংশীদারদের ''ডিভিডেন্ড'' বা লভ্যাংশ মেটাতে ইংল্যান্ডে চলে যায়। এর ওপর ছিল জাতীয় ঋণ, যার ত্র(মবর্ধমান সুদের অংক ভারতের করদাতাদের বহন করতে হত। রমেশচন্দ্রের আ(েপ ঃ ''ভারতের রাজসূর্য যে অর্থ বাষ্প সৃষ্টি করছে তা ভারতে বৃষ্টির মত না পড়ে অন্য দেশে ঝরে পড়ছে, অন্য দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।''

অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে রমেশচন্দ্র রেলওয়ে বনাম সেচ বিতর্কের অবতারণা করেছেন। রেলওয়ে স্থাপনের দায়িত্ব সরকার বিদেশি কোম্পানির উপর ন্যাস্ত করে। লাভ-(তি নির্বিশেষে সরকারি তহবিল থেকে এই কোম্পানিগুলির মূলধনের সুদ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি সরকার দেওয়ায় বিপুল অর্থের অপচয় হচ্ছিল। ভারতে রেলপথ বিস্তারের পিছনে শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বাজার বিদেশি পণ্যের কাছে উন্মুক্ত(করা। ফলে দেশজ শিল্পগুলির বাজার বিনষ্ট হল। রেলওয়ের প্রসার বন্ধ করে সেচের উন্নতির জন্য অধিক অর্থ বিনিয়োগের প(পাতী ছিলেন রমেশচন্দ্র। যুক্তি(হিসাবে তিনি বলেন, সেচের উন্নতি কৃষির উন্নতির সহায়ক, এবং ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। রেলপথ নির্মাণ এবং সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ''হোম চার্জেস'' বেড়ে যাচ্ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ ছিল ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড। জাতীয় ঋণ একই সঙ্গে স্ফীত হচ্ছিল, ১৮৭৭ থেকে ১৯০০ সনের মধ্যে তা ১৩১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২২৪ মিলিয়ন পাউন্ড হয়েছিল। এই পর্বে আফগান যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ ''If manufactures were crippled, agriculture over-taxed, and a third of the revenue remitted out of the country, any nation on earth would suffer from permanent poverty and recurring famines.''

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়েছিল, রমেশচন্দ্র তার সং(প্ত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৭১ সনের পর থেকে পাউন্ডের তুলনায় টাকার দর দ্রুত কমতে থাকে। হোমচার্জেস মেটাতে পরিণামে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ে। ফাউলার কমিটির (Fowler Committee, 1898-99) কাছে প্রদত্ত সা(্য রমেশচন্দ্র টাকার দর কৃত্তিমভাবে বৃদ্ধি করবার বিরোধিতা

করেন। তাঁর প্রধান যুক্তি(ছিল টাকার দর বাড়লে মহাজনের সুবিধা, অন্যদিকে যে ল(ল(কৃষক ও (েতমজুর মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা তাদের ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে। সমস্যার আসল সমাধান ''হোম চার্জেস'' হ্রাস করা, কেননা এই পাওনা পাউন্ডে মেটাতে হয় এবং টাকা বিদেশে চলে যায়।

রমেশচন্দ্র ছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে পরিচালিত ব্রিটিশ শুল্কনীতির কঠোর সমালোচক। ১৮৮২ সালে বিদেশি পণ্যের উপর শুল্ক-কর তুলে নিয়ে সরকার অবাধ বাণিজ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই নীতি ছিল ভারতীয় মূলধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই এবং আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থবিরোধী। ১৮৯৪ সালে সরকার বিলিতি কাপড় এবং সুতোর ওপর ৫% শুল্ক বসায়। ১৮৯৬ সালে তা প্রত্যাহার করা হলেও বিদেশী বস্ত্রের ওপর ৩১/২% আমদানি শুল্ক এবং দেশি বস্ত্রের ওপর একই হারে উৎপাদন শুল্ক বসান হয়। ভারতীয় মালিকরা ছিল শিশু বস্ত্রশিল্পের সংর(ক। সেখানে সরকারের এরকম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ রমেশচন্দ্র না করে পারেননি।

ভারতের অর্থনৈতিক পুন(জ্জীবনের জন্য রমেশচন্দ্র নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রস্তাব দেন

১। ভূমি রাজস্ব হ্রাস।

২। ভূমি রাজস্ব ব্যতীত জমির ওপরর অন্য সব কর বিলোপ।

৩। সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারের অধিক অর্থ বরাদ্দ।

৪। রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণে অহেতুক ব্যয় নিষিদ্ধকরণ।

৫। ভারতের সামরিক ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ।

৬। ব্রিটেন এবং উপনিবেশগুলির মধ্যে সামরিক ব্যয় বন্টন।

৭। ভারতীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে বে-সরকারী (েত্রে ব্যয় হ্রাস।

৮। ভারতীয়দের বস্ত্রশিল্পের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার।

রমেশচন্দ্রের বক্তব্য জাতীয়তাবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আজ শতবর্ষের ব্যবধানে কতকগুলি (েত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডি. আর. গ্যাডগিল বলেছেন ঃ- ''Dutt does not appear to pay much attention to the positive aspects of State policy and action. Indeed, his insistent complaints about high taxation and the level of Government expenditure would indicate a preferencefor a lessening of Government activity and outlay.'' রেলওয়ে, সেচ, রাস্তা, সেতু, সরকারী বাড়ী নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগ উনিশ শতকের শেষার্ধে এক নতুন নীতির সূচনা করেছিল, রমেশচন্দ্র যার গু(ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি নয়, ব্যয় সংকোচনের তিনি সমর্থক। সরকারি বিনিয়োগ এবং সরকারি উদ্যোগের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাননি বলে মনে হয়। সেচ বনাম রেলওয়ে বিতর্কটি ছিল অনাবশ্যক। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের (েত্রে দুই-ই সমান গু(ত্বপূর্ণ হওয়ায় উভয় (েত্রেই সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। ব্যয় সংকোচনের নীতি দেশের কৃষিপ্রধান অনগ্রসর কাঠামোকে বজায় রাখতে সাহায্য করত। সন্দেহ নেই, ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্য্যায়ে সরকারী নীতি বিদেশী সংস্থাগুলি পাহাড় প্রমাণ মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরে রেলপথের অবদান কম নয়। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির সুপ্ত

সম্ভাবনা তা বাস্তবে খুলে দিয়েছিল। কয়লা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। রেলপথ এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ কর্ম সংস্থাপনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ভারতে রেলপথ হবে ''আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত''— মার্কসের বিখ্যাত উক্তি(প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়।

''হোম চার্জেস''প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের সমালোচনা সম্পূর্ণ গ্রহণ সম্ভবযোগ্য। তিনি একে ''অর্থনৈতিক ড্রেইন'' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ''হোম চার্জেস''-এর অন্তর্ভুক্ত(ছিল রেলপথ নির্মাণ বাবদ ঋণের সুদ এবং ভাণ্ডার (stores) কেনার টাকা। মেইজি পর্বে জাপানও বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছিল, সুদের টাকা তাকেও গুণতে হয়েছিল। যা সত্যই সমালোচনার বিষয় তা হ'ল রেলওয়ে নির্মাণের সরঞ্জাম বিদেশে কেনার নীতি, ভারতে এই সরঞ্জাম নির্মাণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনীহা। সমগ্র ঔপনিবেশিক পর্বে এই নীতি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল(ভারতে ইঞ্জিন তৈরির কাজ শু(হয় স্বাধীনতার পরে।

ভাণ্ডার ত্র(য় (Stores purchase) নীতি রমেশচন্দ্র বিবেচনা করেননি। রেলপথ সড়ক, সেতু, পোতাশ্রয়, বন্দর বাড়ি ও সেনানিবাস প্রভৃতি নির্মাণের কাজে সরকারের ভাণ্ডারে র(িত পণ্য ব্যবহৃত হত। রিপনের সময় থেকে ভাণ্ডার ত্র(য় নীতির কঠোরতা শিথিল হতে আরম্ভ করলে দেখা গেল যে কয়েকটি ভারতীয় শিল্প— যেমন কাগজ শিল্প, পশম শিল্প, চামড়া শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প— লাভবান হয়। সরকারকে মাল সরবরাহ করে এই শিল্পগুলি নির্দিষ্ট মুনাফা লাভের সুযোগ পেয়েছিল। বিদেশি প্রতিযোগিতার মুখে দেশের সংকুচিত বাজারের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়নি। দেশের বাইরে ভাণ্ডার ত্র(য়ের দাবি তাই সমসাময়িক সংবাদপত্রে এবং ভারতীয়দের লেখায় ও বক্ত(তায় বার বার উঠেছিল।

''কৃষক'' বলতে রমেশচন্দ্র বুঝতেন যে রায়ত ভূমি-রাজস্ব দেয়। কিন্তু যে কৃষক জমির মালিককে খাজনা (rent) দেয়, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি যায়নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যায় বেড়ে চলেছিল(ঋণের দায়ে জমি বিত্রি(র ঘটনা তখন ব্যাপক। কৃষকদের একটি অংশ হয়ে পড়েছিল জমিহীন (্তমজুর। ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটির বিবরণে এই অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছিল। ভূমিকর হ্রাসের যে দাবি রমেশচন্দ্র করেছিলেন কৃষকদের এই অংশকে (অর্থাৎ যারা খাজনা দিত, অথবা যারা (্তমজুর) তা স্পর্শ করত না। বাংলায় কৃষি ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে জমিদার হয়ে উঠেছিল খাজনা আদায়কারী। অজস্র মধ্যসত্বভোগীর আবির্ভাব হয়, কৃষকদের কাছ থেকে অত্যধিক খাজনা আদায়ে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। মহাজনী কারবার এবং বর্গা প্রথা পরিণামে বিস্তার লাভ করে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় কৃষকদের যে রঙিন চিত্র রমেশচন্দ্র এঁকেছেন তা কেবল তাঁর কল্পনাতেই ছিল।

১১.৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস এবং পর্ব বিভাজন সমস্যা

১৯১৭ সালের বলশেভিক সাফল্যে অসংখ্য মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র শোষণহীন নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মার্কস এবং এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (১৮৪৮) রচনার মাধ্যমে সর্বহারাদের শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (dialectical materialism)। ইতিহাসে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁরা বলেন, উৎপাদন প্রত্রি(য়া এবং তার সঙ্গে সং(-ষ্ট সামাজিক সম্পর্ক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। উৎপাদন পদ্ধতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা সম্পদের

অধিকারী। সাধারণ মানুষকে শোষণ করে তারা বিত্তবান হয়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার ল(ণানুযায়ী মার্কস এ পর্যন্ত ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেন— যেমন আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদ। প্রতিটি ব্যবস্থাই নিজের সংকটের বীজ বহন করে। যারা সম্পদের মালিক তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে অন্য শ্রেণী। মার্কসের মতে শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র বিপ-বের নেতৃত্ব দেবে এবং এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে অপে(াকৃত সচেতন অংশ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। আন্দোলন পরিচালনায় পার্টির বিশেষ দায়িত্ব আছে।

মার্কসবাদ কেবল তত্ত্বকথা নয়। বরং মার্কস বলেন— ১১এ পর্যন্ত দার্শনিকরা সমাজে ব্যাখ্যা করেছেন(কিন্তু মূল কর্তব্য হল সমাজের পরিবর্তন সাধন। এখানেই মার্কসবাদের বিশেষত্ব। মার্কসীয় তত্ত্বের সারমর্ম বোঝাতে এঙ্গেলস এক চিঠিতে বলেছিলেন— রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ত্র(মবিবর্তন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে, আবার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকেও। এমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই হল কারণ, একমাত্র তা-ই সত্রি(য়, বাকি সবকিছু নিষ্ি(য় পরিণাম। ত্রি(য়া-প্রতিত্রি(য়া বরং ঘটে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, যা চূড়ান্ত নির্ণায়ক। (''Political, juridical, philosophical, religious, literary artistic etc. development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic basis. It is not that the economic situation is the *cause, solely active,* while everything else is only passive effect. There is, rather, inter-action on the basis of economic necessity, which ultimately always asserts itself.''- Engels to W. Borgius, 25 January, 1894, quoted in Karl Marx and Frederick Engels, *Collected works,* 1970, 694)

১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাসখন্দে (বর্তমান উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী, আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত(), প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি শু(তে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯২০) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **মানবেন্দ্রনাথ রায়** (১৮৮৭-১৯৫৪) লেনিনের বক্ত(ব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। লেনিন ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। অপরদিকে রায় বলেন, গান্ধী আন্দোলন জনগণের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, বুর্জোয়া নেতৃত্বে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। ১৯২২ সালে তাঁর লেখা *India in Transition* গ্রন্থে এই মত প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথ প্রদর্শক এস. এ. ডাঙ্গে। *Gandhi vs Lenin* নামে একটি গ্রন্থে (১৯২১) ইতিমধ্যেই লেনিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নেতা হিসেবে গান্ধীজির সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি এসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। প্রথম কয়েক বছর এই দায়িত্ব পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন **সাপুরজি সাখলাতওয়ালা** (১৮৭৪-১৯৩৬)। তিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ত্র(মশ তাঁর স্থান গ্রহণ করেন রজনী পাম দত্ত (১৮৯৬-১৯৭৪)। তাঁর বিখ্যাত রচনা *India Today*। ১৯৪০ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলিতে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে সমকালের ঘটনা এই গ্রন্থে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বি(-ষণ করা হয়। দত্ত ছিলেন অক্সফোর্ড বি(বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ সালে (শ বিপ-বের সমর্থনে মিটিং করার অভিযোগে তিনি বি(বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেও বি(বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরী(ায় বসার বিশেষ অনুমতি লাভ করেন। পরী(ার ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের

কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্ত(ছিলেন তিনি। পার্টির প(থেকে প্রকাশিত পত্রিকা প্রকাশ এবং সম্পাদনায় তিনি দীর্ঘকাল নিযুক্ত(ছিলেন। ব্রিটেনে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে তাঁর বক্ত(ব্যে আকৃষ্ট হয়ে মার্কসবাদে দী(গ্রহণ করেন— যেমন সজ্জাদ জহীর, জেড. এ. আহমদ, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেণু চক্র(বর্তী প্রমুখ। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। দত্তর বক্ত(ব্য মার্ক্সবাদী মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কংগ্রেসে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বিবিধ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব যেমন এই শ্রেণী গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে সেই আন্দোলন যাতে চরম আকার ধারণ করে কায়েমী স্বার্থের বিপদ না ঘটায় সেদিকে তারা ল(রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে বলে দত্ত মনে করতেন। ''Two-fold or vacillating role of the Indian bourgoesie and desiring to lead the Indian people, yet fearing that 'too rapid' advance may end in destroying its privileges along with those of the imperialists.

''This contradiction reached its culmination in the period of revolutionary upsurge after the second world war, when the leadership of the National Congress reached what they declared to be a final settlement with imperialism by the acceptance of the Mountbatten Award for the partition of India and the establishment of the Dominions of India and Pakistan.'' ***(R. P. Dutt, India Today Chap. X)***

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের পূর্বে বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১)। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি ''যুগান্তর'' গোষ্ঠির সদস্য ছিলেন। ১৯০৬ সালে বিপ্-বীদের মুখপত্র *সাপ্তাহিক যুগান্তর* পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ সালে তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এক দশকের অধিককাল প্রবাসে জীবনযাপন করেন। যুক্ত(রাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে বিপ্-বী **গদর দল** এবং নিউইয়র্কের **সোসালিস্ট ক্লাবের** সংস্পর্শে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। প্রথম বি(্বযুদ্ধের সময় বার্লিন শহরে ভারতীয় বিপ্-বীদের গঠিত **বার্লিন কমিটির** তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২ সালে নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম জার্মানীর হামবুর্গ বি(্বিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রিতে ভূষিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে কমিউনিস্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আমন্ত্রণে তিনি মস্কো শহরে যান। সেখানে ভারতে কমিউনিস্ট বিপ্-বের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেন। এই পরামর্শ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা **সরোজ মুখোপাধ্যায়** (১৯১১-১৯৯০) বলেন— ''১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল এই গু(ত্বপূর্ণ দশটি বছর বাংলার বুদ্ধিজীবী স্বদেশী মহলের কাছে রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।'' উপরন্তু— ''তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলার যুব সমাজ সমাজতন্ত্রবাদের দী(ত হয়ে উঠেন।'' (**সরোজ মুখোপাধ্যায়,** *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ও আমরা, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)।

ভূপেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেকে সীমিত রাখেননি। ১৯২২ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম সংক্র(ান্ত একটি কার্যক্র(ম পেশ করেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে শ্রমিক-কৃষকদের মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। বঙ্গীয় কৃষক সভার তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি দুবার সভাপতিত্ব করেন। বাংলায় তিন খণ্ডে *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* তাঁর বিখ্যাত রচনা। *Dialectics of Hindu Ritualism* এবং *Dialectics* of *Land Economics of India* নামে দুটি ইংরেজি গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর

ধারণা ব্যক্ত(করেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস পুন(দ্ধারে একটি বড় অসুবিধা হল নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব। ভূপেন্দ্রনাথ এই অভাব পূরণের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য এবং শিলালেখের ওপর বিশেষ নির্ভর করেন। গবেষণা মাধমে তিনি প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। ঋগ্বেদে শাসকদের ভূমিদানের ফলে ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে দেখি, *মঘবান এবং মহাকুল* প্রভৃতি শব্দের দ্বারা চিহ্নি(ত করা হত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর Indian Polity গ্রন্থে ভূপেন্দরনাথ এইভাবে নির্দেশ করেন ঃ- **মহারাজাধিরাজ → মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্ত, মহামণ্ডলিক** (অর্থাৎ সামন্ত প্রভু) → **সামন্ত, মণ্ডলিক, মণ্ডলাধিপতি, মণ্ডলপতি, মণ্ডলে(্বর** (মণ্ডল অর্থ রাষ্ট্রের একাংশ) → **ভুক্তি(পতি** (ভুক্তি(অর্থ প্রদেশের অংশবিশেষ) **মহাভোগপতি, ভোগপতি, মহাভোগিক, ভোগিক → বিষয়পতি** (অর্থাৎ জেলাপ্রধান), **গ্রামপতি → ষষ্ঠাধিকৃত** (অর্থাৎ যিনি রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করতেন) → **ভোজক** (সম্ভবত নিষ্কর জমির মালিক) → **কুটুম্বি (েত্রকর, কর্ষক (েত্রপ,** (অর্থাৎ, কৃষক যেখানে জমির মালিক) → বর্গাদার → ভূমিহীন কৃষক। সর্বশেষ দুটি স্তরে স্বতন্ত্র উল্লেখ শিলালেখে মেলে না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে ভূপেন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতীয় কৃষক সর্বদাই শোষিত হত।

চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ নতুন আলোকপাত করেছেন। পু(ষ সুক্ত(বাদে ঋগ্বেদে কোথাও চতুর্বর্ণের উল্লেখ নাই। বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন পু(ষ সূক্ত(অংশটি প্র(িপ্ত, মূলে ছিল না। বর্ণ এবং বৃত্তির মধ্যে প্রথমে কোন বিভেদ ছিল না। এই কারণে আমরা সব ব্যক্তি(র সন্ধান পাই যারা নিজেদের বর্ণের প(ে স্বাভাবিক বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে নিয়োজিত। ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি(একই গোত্রোদ্ভূত হওয়ার মধ্যেও আমরা এই বক্ত(ব্যের সমর্থন পাই। বংশানুত্র(মিকভাবে বৃত্তি পালনের মধ্যে দিয়ে বর্ণব্যবস্থা দৃঢ়তা লাভ করে বলে ভূপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ শ্রেণী হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করে। শ্রেণী ছিল পাশ্চাত্য গিল্ডের সমতুল্য। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, শ্রেণী ত্র(মশ জাতিতে (Caste) রূপান্তরিত হয়। তবে বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে এর কোন সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ যে জাতিভেদের সহায়ক হয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। মার্কসের শ্রেণী (Class) সংগ্রামের তত্ত্ব ভূপেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। ব্রাহ্মণদের তিনি সমাজে প্রতিত্রি(য়াশীল অংশ হিসাবে গণ্য করেন। বর্ণভেদ প্রথার সমর্থনে তারা শাস্ত্রের যুক্তি(অবতারণা করতেন। রাজশক্তি(কিভাবে সামাজিক বর্ণ নির্ধারণ করল *বল্লাল চরিত* গ্রন্থ থেকে ভূপেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ দিয়েছেন। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় অতীতে বৈশ্য-রূপে গণ্য হলেও বল্লাল সেনের বিধানে সমাজে একঘরে হয়ে পড়ে। অথচ কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার এবং কৈবর্ত সম্প্রদায় ঐ একই রাজার কাছ থেকে সৎ-শূদ্রের মর্যাদা লাভ করে। মৌর্য এবং পাল বংশ ভূপেন্দ্রনাথের মতে শূদ্র শক্তি(র প্রকাশ, থানে(্বরের মৌখারি বংশকে তিনি বৈশ্য জ্ঞান করতেন। গুপ্ত যুগে তাঁর বিবেচনায় ব্রাহ্মণতন্ত্র চরম প্রতিত্রি(য়াশীল হয়ে উঠেছিল। এসব সিদ্ধান্ত বিতর্কমূলক। ভূপেন্দ্রনাথের কাছে যে তথ্য ছিল তার সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের অবস্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস রচনায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার-বি(ে-ষণে তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর পাণ্ডিত্য ও সমাজ সচেতনতা গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস চর্চায় মার্কসবাদীদের অবদান বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো নয়। একজন বামপন্থী গবেষক স্বীকার করেছেন ঃ- ‘‘সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলেও ভারতে ইংরেজ শাসন শু(হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা এর কিছু আগে-পরে সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন, এমন প্রমাণ চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের রেনেসাঁস সম্বন্ধে যেসব মত চালু ছিল তার যথার্থ

বিচারেও কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। সম্ভবত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর অনুরোধত্র(মেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার এদিকে দৃষ্টি নি(েপ করেন এবং Notes on the Bengal Renaissance নামে কাজ চলার মতো একখানি ইংরাজী পুস্তিকা আমাদের হাতে তুলে দেন। এই পুস্তিকা যত সং(িপ্ত আর অসম্পূর্ণ হোক না কেন এর জন্য পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই অধ্যাপক সরকারের প্রাপ্য।" (ধনঞ্জয় দাস, *মার্কসবাদী সাহিত্য প্রসঙ্গ,* প্রথম খণ্ড, ৬৯।) *ইতিহাসের ধারা* নামে বাংলায় অধ্যাপক সরকার প্রণীত অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করতে হয়। সহজ ভাষায় সং(েপে এখানে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসারে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত চরিত্র সম্পর্কে চল্লিশের দশকে আলোচনা করেন **গোপাল হালদার** (১৯০২-৯৩), **বিনয় ঘোষ** (১৯১৭-৮০) এবং **নরহরি কবিরাজ** প্রমুখ। বিদেশ থেকে ফিরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন **হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।** আলিগড় বি(বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মহম্মদ হবিব (১৮৯৫-১৯১৭) এই সময়ে মার্কসবাদে দী(িত হন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। সুলতানী আমলে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

ইতিহাস চর্চার প্রচলিত ধারার বাইরে অবস্থান করেন দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (১৯০৭-৬৬)। গোয়ার কোসবেন নামক স্থানে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষজ্ঞ। দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা পুত্রের মধ্যে বর্তেছিল। যুক্ত(রাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড বি(বিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপনা সূত্রে তিনি যুক্ত(থাকায় দামোদর উক্ত(প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শি(া লাভ করেন। বিষয় হিসাবে তিনি ইতিহাস, গণিত এবং ভাষাবিদ্যা নির্বাচন করেন। মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, পালি, আরবী, লাটিন, গ্রীক এবং ফরাসী ভাষা শি(া করেছিলেন। বারাণসী এবং আলিগড় বি(বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে অল্পকাল দায়িত্ব পালনের পর তিনি পুনার ফার্গুসন কলেজে যোগ দেন। কর্মজীবনের দীর্ঘতম (১৯৪৭-৬২) তিনি টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত(ছিলেন। ১৯৬৫ সালে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসস্ট্রিয়াল রিসার্চ তাঁকে এমেরিটাস প্রফেসর পদে বরণ করে। কিন্তু পরের বছর অকালে তাঁর প্রয়াণ হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে কোশাম্বী দুটি গ্রন্থ রচনা করেন ঃ *An Introduction to the study of Indian History* (১৯৫৬) এবং The Culture and civilization of Ancient India (১৯৬৫)। Exasperating Essays; Exercises in the Dialectical Method (১৯৫৭) এবং Myth and Reality, Studies in the formation of Indian culture (১৯৬২) নামে দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। প্রথমটিতে তিনটি এবং দ্বিতীয়টিতে পাঁচটি প্রবন্ধ যথাত্র(মে ভারতের ইতিহাস সংত্র(ান্ত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুন(দ্ধারের পথে প্রধান বাধা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতা। আকরিক উপাদানগুলির (সাহিত্য, মুদ্রা, শিলালেখ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি) সমন্বয় ব্যতীত ঐতিহাসিক চিত্র যথাযথভাবে উপাদান ব্যবহারে তাঁর সতর্কতা ল(ণীয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলির ওপর তিনি অধিক গু(ত্ব আরোপ করতেন, যেহেতু এখানে প্রাপ্ত তথ্য শিলালেখের দ্বারা সমর্থন করা যায়। তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বি(্বাসী ছিলেন। উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফল তিনি গু(ত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। কারণ তিনি মনে করতেন, খাদ্যোৎপাদনে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন হেতু মানুষের শারীরিক গঠনের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার প্রতি নৃতাত্ত্বিকরা উপযুক্ত(গু(ত্ব আরোপ করেন না। তবে তিনি মনে করতেন (েত্র সমী(া প্রয়োজন। কারণ প্রাচীন কালের সব চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয়নি। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কোশাম্বী জনশ্রুতি এবং কল্পকথাকে (Myth) অবহেলা করেননি, যেহেতু সাধারণের বি(্বাসের প্রতিফলন তাতে ঘটেছে। *An Introduction to the study of Indian history* ভারতের ইতিহাসের কোন আনুপুঙ্খিক বিবরণ নয়। আলোচনার জন্য ভারত ইতিহাসের

প্রধান ধারাগুলি এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে। দশটি অধ্যায়ে আলোচনা বিভক্ত। বিষয়টির প্রারম্ভিক ধারণা এবং আলোচনা পদ্ধতি বর্ণনার পর সমাজে শ্রেণী বিকাশের পূর্বেকার অবস্থা, সিন্ধু সভ্যতা, আর্যদের আগমন ও বিস্তার, মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার, গ্রামীণ অর্থনীতির সংগঠন, বাণিজ্য ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। *The Culture and Civilization of Ancient India* গ্রন্থে অনুরূপ বিষয় বিন্যাস ঘটান হয়েছে। সাক্ষ্য-সাবুদের অভাবে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রযুক্তিগত বিবর্তন এবং তার অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে কোশাম্বী যথার্থই আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মূল কথা হল সমাজ ও সংস্কৃতির মূলস্রোতে আদিবাসীদের আত্তীকরণ (assimilation)। বিভিন্ন সময় যেসব বিদেশি জনগোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছে উপজাতিদের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের আচারানুষ্ঠান, প্রচলিত বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি।

বিজ্ঞানমনস্কতা কোশাম্বীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সন-তারিখ চিহ্নিত প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি আগ্রহ বোধ করেননি। কারণ শ্রেণীগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব পাল্টায়। একই ঘটনা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান তাৎপর্য বহন করে না। উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন অনুসন্ধানের ওপর কোশাম্বি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মার্কসের সব সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেননি। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি, ''ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই, অন্তত জানা এমন কোন ইতিহাস নেই'' (''Indian society has no history at all, at least no known history'')। এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত কোশাম্বীর রচনা তা প্রমাণ করে। এশিয়া মহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, উৎপাদন ব্যবস্থা নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করেছে— মার্কসের ইত্যাকার বক্তব্য ভারত ইতিহাস সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের ফল বলতেও কোশাম্বী দ্বিধা করেননি। উদাহরণত, হল চাষ প্রবর্তন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। মৌর্য, সাতবাহন এবং গুপ্ত যুগের মতো প্রাচীনকালের সাম্রাজ্যগুলি গ্রাম সমাজের বিকাশের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার এবং সৈন্য বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং কৃষিতে প্রচুর উৎপাদন। না হ'লে রাষ্ট্রের পক্ষে বিরাট রাজস্ব আদায় করা সম্ভব নয়। গুপ্ত যুগে গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে বাণিজ্যিক লেন-দেন ব্যাহত হয়। এই সময় থেকেই ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূচনা। ভক্তি আন্দোলন তাকে আরও সুদৃঢ় করে। গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ বলতে কোশাম্বি অস্বীকার করেন। কবিকুল এবং পুরোহিততন্ত্রের চেষ্টায় তাঁর মতে গুপ্ত যুগ ''স্বর্ণযুগ'' আখ্যা লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বর্ণযুগ রয়েছে ভবিষ্যতে, অতীত ইতিহাসে নয়। তবে ইতিহাস চর্চা থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি।

কোশাম্বির বক্তব্যের সঙ্গে সব ঐতিহাসিক একমত হবেন আশা করা যায় না। উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তিনি মন্তব্য করেছেন। মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ স্নানাগারকে তিনি মনে করেন পবিত্র জলাধার সংক্রান্ত ধারণার (যেমন পুষ্কর হ্রদ) পূর্ববর্তী একটি নির্দশন। নাগরিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং কৃষির উৎপাদন আনুপাতিক না হওয়ায় সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়েছিল,— কোশাম্বির এই মন্তব্যও কম বিতর্কমূলক নয়। অভ্যন্তরীণ পণ্য বন্টনে মন্দির এবং পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে তিনি মনে করেন। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের জন্য তিনি সঙ্ঘ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন, যেহেতু উৎপাদন তাদের কোন অবদান ছিল না। কোশাম্বী মনে করতেন, সামাজিক সংগঠন উৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক উন্নত হতে পারে না। উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার অধিকারীর পক্ষে কেবল কোন জনগোষ্ঠীর মুখে ভাষা জোগান সম্ভব। এসব সিদ্ধান্তের পিছনে কোন তথ্যগত সমর্থন নেই। কিন্তু

আমরা শু(তেই বলেছি, প্রচলিত ইতিহাস চর্চার পথ কোশাম্বী পরিহার করেছেন। অনুসন্ধিৎসার ব্যাপ্তি, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনায়াস দখল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা এবং ভাষার প্রসাদগুণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি অনন্য মর্যাদায় ভূষিত।

গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের প্রচলিত পর্ব বিভাজনে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। **জেমস মিল** তাঁর ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে এদেশের প্রাচীন এবং মধ্যযুগকে সর্বপ্রথম ''হিন্দু'' এবং ''মুসলিম'' আখ্যা দেন। ব্রিটিশ শাসনকালকে আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নি(ত করা হয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, প্রাচীনকালে এদেশে কেবল হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধ, জৈন এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। সিংহাসনেও তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন যুগকে এক কথায় তাই ''হিন্দু' বলা সঙ্গত নয়। অনুরূপ আপত্তি ''মুসলিম'' যুগ নামকরণেও। তাছাড়াও কই, ইংরেজ রাজত্বকালকে তো শাসকদের ধর্মানুযায়ী আমরা ''খৃষ্টান'' যুগ বলছি না। ইতিহাসের পর্ব বিভাজনের (ে ত্রে শাসক বংশ (মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি) কিংবা রাজনৈতিক (ে ত্রে (মতাসীন জনগোষ্ঠী (যথা রাজপুত কিংবা ইলবরী তুর্ক) বিশেষভাবে উল্লেখ করার রীতিও সুপ্রচলিত। কিন্তু কখন যে একটি যুগ শেষ হয়ে অপর একটির সূচনা হচ্ছে তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত(। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর *History of Medieval India* গ্রন্থের শু(করেন আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় থেকে (৭১২ খ্রিস্টাব্দ)। অথচ বর্তমানে আমরা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতককে ''আদি মধ্যযুগ'' গণ্য করি। আধুনিক ভারত ইতিহাসের সূচনা কোথা থেকে— ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) না পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) নাকি ১৮৫৭ পর্যন্ত তা বিস্তৃত? দ(িণ ভারতে হিন্দু শক্তি(অ(ুণ্ণ ছিল দিল্লী সুলতানী প্রতিষ্ঠার বহুদিন পর পর্যন্ত(পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ রাতারাতি ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাচীন ভারতে কাল গণনার রীতি আধুনিক ধারণার সঙ্গে মেলে না। এই অবস্থায় আমরা ভারতীয় ইতিহাসে পর্ববিভাজনের সমস্যার মীমাংসা এখনও করতে পারিনি। নিরবচ্ছিন্ন কাল প্রবাহের কথা স্মরণ করলে এমন বিভাজন আদৌ সম্ভব কিনা, সে প্র(্ন থেকে যায়।

১১.৫ অনুশীলনী

১) ভারতের স্বর্ণযুগ কোন সময়কে বলা হয় ও কেন বলা হয়?

২) মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস বর্ণনা কিভাবে করা হয়েছে।

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

S.K. Mukhapadhyay - Evolution of Historiography in Modern, India, 1900-1960.

S. P. Sen ed. - Historian and Historiography in Modern India.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত - ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

শ্যামলী সুর - ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত - স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক।

একক ১২ ❑ ঐতিহাসিক বিতর্ক

গঠন

১২.০ প্রস্তাবনা
১২.১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র
১২.২ আঠার শতকের ভারত
১২.৩ অনুশীলনী
১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ প্রস্তাবনা

ভারতের ইতিহাস চর্চায় এখনও যেসব সমস্যার সমাধান হয়নি দুটি উদাহরণ যোগে আমরা সর্বশেষে তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস গতিশীল। নতুন নতুন সমস্যা যেমন তার যাত্রাপথে আত্মপ্রকাশ করে, সেরকম আলোচনা ৫(ত্রেও বিস্তৃত হয়। লিঙ্গভেদ এবং পরিবেশ চেতনা দুটি প্রধান বিষয় হিসেবে ইদানীং বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ গু(ত্ব লাভ করেছে। ভবিষ্যতে আশা করা যায় অনেক আরও অভিনব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবন্ধ হবে। ইতিহাস রচনার অতীত পশ্চাৎপট মনে রাখলে সাম্প্রাতিক ধারা বোঝা সহজ হবে, এই আশায় বর্তমান পাঠসহায়িকা প্রস্তুত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে।

১২.১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্রের ল(ণ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। মার্কস মনে করেন ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে দাস ব্যবস্থার অবসানে তার আবির্ভাব। সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এই বিচারে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন দেশের নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ থাকে না। তার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, উৎপাদন প্রক্রি(য়ার সঙ্গে যা যুক্ত(। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মার্কস বুঝেছিলেন কায়িক পরিশ্রম করে না এমন ভূ-স্বামীদের মালিকানাধীন অথবা তাদের অধিকারভুক্ত(বড় বড় ভূ-সম্পত্তিতে অধীনস্থ উৎপাদকদের দ্বারা কৃষিজ এবং কারিগরী উৎপাদনের এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম অথবা শ্রমজাত পণ্যের দেওয়া/আদায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা নির্ধারিত হত না। উৎপাদক শ্রেণীগুলির ওপর মালিকানা স্বত্ব/অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্য(রাজনৈতিক, সামরিক এবং আইনের শক্তি(দ্বারাই তা সংগঠিত হয়। **মার্ক ব্লক** - এর ধারণায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অধীনতা (vassalage) এবং র(ণাবে(ণের (patronage) পারস্পরিক সম্পর্কে মানুষ আবদ্ধ। বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এর প্রধান ল(ণ। **মরিস ডব** সামন্ততন্ত্রকে ভূমিদাসত্বের সঙ্গে প্রায় সমার্থক রূপে চিহ্নি(ত করেছেন। ভূমিদাসত্ব বলতে তাঁর মতে কেবল বাধ্যতামূলক কায়িক সেবাই বোঝায় না, আইন এবং রাজনীতি মারফৎ উৎপাদকের শোষণের কথা এইসঙ্গে বুঝতে হবে। **পেরী অ্যান্ডারসন** এবং **রবার্ট ব্রেনার** প্রমুখ সাম্প্রতিক মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে বলে মনে করেন না।

মার্কসীয় আলোচনা পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য গবেষক মহলের অনেকে একমত নন। এফ. এল. গ্যানসফ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য এমন কতগুলি প্রতিষ্ঠান যা অধীনতা ও সেবার— প্রধানত সামরিক— বাধ্যবাধকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেবার বিনিময়ে ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন প্রভু। **এম. এম. পোস্টান** বলেন, চাষীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ ছিল অর্থনীতির মূল নির্ভর। কিন্তু জমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত(গু(ত্ব দেওয়া উচিত নয়। পোস্টান-এর ব্যাখ্যায় সামন্ততন্ত্রের ল(ণ প্রকট হয় যখন ভূসম্পত্তি ছিল জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল, কৃষি ও বাণিজ্যের গতি ছিল মন্থর। **এলিজাবেথ এ. আর ব্রাউন** সামন্ততন্ত্র শব্দটি প্রয়োগে আপত্তি করেছেন তা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না বলে। এইসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ ল(ণ নির্ণয় করা যায়। মধ্যযুগের ইউরোপে যে সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জমির পত্তনি-ব্যবস্থা। উচ্চতর সামন্তপ্রভুরা নিম্নতর সামন্তদের মধ্যে, আবার নিম্নতর সামন্তরা কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন বা বিলি-বন্দোবস্ত দিতেন এবং এইভাবে ভূমিকে ভিত্তি করে পিরামিডাকৃতি সমাজের স্তর-বিন্যাস হত। তবে এমনকি ইউরোপেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন সার্বজনীন রূপ ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে যেভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে তা ঘটেনি।

ভারতীয় পরিপ্রে(তে সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত করেন **ডি. ডি. কোশাম্বি**। *An Introduction to the Study of Indian History (1956)* গ্রন্থে তিনি বলেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে বিভিন্ন সামন্ত অঞ্চল গঠিত হয়। শাসকরা জমির ওপর অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক অধিকার সামন্তপ্রভূদের হাতে তুলে দেন। কোশাম্বী এই প্রক্রি(য়াকে বলেছেন ওপর থেকে অরোপিত সামন্ততন্ত্র *Feudalism from above,* সামন্তপ্রভুরা ক্র(মশ প্রজাদের ওপর অধিকার খাটাতে থাকে। রাষ্ট্র এবং কৃষকের মধ্যে অন্তর্বর্তী স্তর হিসাবে তারা দেখা যায়। কোশাম্বীর ভাষায়, এ হল তলদেশ থেকে সামন্ততন্ত্র, *Feudalism from below.* **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** অবশ্য এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। কোশাম্বির দৃষ্টিতে ভারতের ঊর্ধ্ব এবং নিম্নস্তর থেকে সামন্ততন্ত্র একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মার্কসের ব্যাখ্যানুযায়ী উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের মূল চালিকা শক্তি(। মার্কসবাদীর প(রাষ্ট্রের ওপর তলা থেকে সামন্ততন্ত্রের নিম্নদিকে বিস্তার মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কোশাম্বী স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেননি ভারতে সামন্ততন্ত্র কবে শেষ হল। *Culture and Civilization of the Indian People* গ্রন্থে তিনি অবশ্য জানিয়েছেন ব্রিটিশরা এদেশে এক নতুন ধরণের উৎপাদন মান চালু করে যা ধনতন্ত্রের অন্তর্গত।

প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের আলোচনা বিস্তারিত রূপ ধারণ করে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে **অধ্যাপক আর. এস. শর্মা** প্রণীত *Indian Feudalism* গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। তাঁর মতে ভারতের ইতিহাসে সামন্ত্রতন্ত্রের সূচনা খ্রিস্টিয় ৩০০ থেকে ৬০০ সময় সীমায়। পরবর্তী কয়েক শতক ধরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ৯০০-১২০০ খ্রিঃ-এর চরম পরিণতি ল(্য করা যায়। প্রধানত তিনটি অঞ্চলের ওপর শর্মা আলোকপাত করেছেন। প্রথম, গুর্জর ও প্রতিহারদের শাসনাধীন উত্তর ও পশ্চিম ভারত(দ্বিতীয় পাল শাসিত বিহার ও প্রাচীন বাংলার বিস্তৃত ভূখন্ড(এবং শেষতঃ রাষ্ট্রকূট অধিকৃত দা(ণাত্য। কোন প্রক্রি(য়ায় ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়? অধ্যাপক শর্মা এরও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। গুপ্তযুগে মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের নিয়মিত কর্ষণযোগ্য জমি দান করা হত। একে বলা হয় **অগ্রহার।** যারা এইসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা যেসব চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করাতেন তাদের অবস্থা ছিল অস্থায়ী রায়তদের মতো। উত্তরাধিকার সূত্রে ও দান উপল(কৃষি-জমি উত্তরোত্তর খন্ডিত হয়। এইসব (দ্র (দ্র জমিতে শূদ্ররা ভাগচাষীর কাজ করত।

পুরোহিত শ্রেণী চাষীদের কাছ থেকে খাজনা পেলেও রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেবার বাধ্য-বাধকতা তাদের ছিল না। ফলে তাঁরা একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি ((ত্রস্বামী) হিসাবে দেখা দেয়। মহীপতি বা রাজা ও কর্ষকের মধ্যে প্রত্য(সম্পর্কে ছেদ পড়ে। স্বাধীন কৃষকরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। কেননা, নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণি ইচ্ছামতো পুরাতন কৃষকদের উৎখাত করে নতুন ভাবে অন্য কৃষকদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করে তাদের কাছ থেকে বেগার শ্রম ও অন্যান্য অতিরিক্ত(কর আদায় করতে পারতেন। দানগ্রহীতাদের প্রশাসনিক ও বিচার-সংক্রা(ন্ত (মতা ও অধিকার ছিল। গ্রামাঞ্চলে রাজা এবং সৈন্য কিংবা সেনাবিভাগের রাজপু(ষেরা ছাউনি ফেললে গ্রামবাসীদের রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব অনেক সময় আদায় ও ভোগ করতেন। এর ফলেও স্বাধীন কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

গুপ্তযুগে শহরাঞ্চলে অব(য় অধ্যাপক শর্মার বক্ত(ব্যের অপর এক দিক। এই তত্ত্বের সমর্থনে ১৯৮৭ সালে তিনি Urban Decay in India (c. 300- c. 1000) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুটি পর্যায়ে এই অব(য় ঘটেছিল। প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিংবা চতুর্থ শতকে(অপরটি ষষ্ঠ শতকে। অধ্যাপক শর্মা এর বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করেছেন— যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বহিরাক্র(মণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্মীয় প্রবণতা। পুরাণে কলিযুগের বিবরণে তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকের সামাজিক সঙ্কট ধরা পড়েছে বলে অধ্যাপক শর্মা মনে করেন। *বৃহৎসংহিতা* এবং ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সা(উদ্ধার করেছেন। খনন কার্যের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার অবশেষ পূর্ববর্তী তিন শতকের তুলনায় সংখ্যায় অল্প। আগের মতো দুর্মূল্য সামগ্রী আর চোখে পড়ে না। গৃহনির্মাণের উপকরণগুলি অপে(াকৃত নিকৃষ্ট। অধ্যাপক শর্মার মতে মুদ্রার অপ্রতুলতা গুপ্তযুগে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়েছিল। গুপ্তরা দৈনন্দিন কেনাবেচায় প্রয়োজনীয় তাম্র-মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন কম। ফলে উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা আঞ্চলিক হয়ে পড়ে। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীরা এতদিন রাজার বেতনভোগী ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্যিক সংকোচন ও মুদ্রা ব্যবহারের পরিণামে অধ্যাপক শর্মার অনুমান নগদ বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা রদ হয়। গুপ্তযুগে শাসন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রী-ভূত রূপ ধারণ করে। অগ্রহার ব্যবস্থায় রাজাকে দিতে না হলেও অভিজাত সামন্তদের বোধহয় তাদের এলাকা থেকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করতে হতো।

প্রাচীন ভারতের সামন্ততন্ত্র প্রসঙ্গে অধ্যাপক শর্মার বক্ত(ব্য ঐতিহাসিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক ডি. এন. ঝা, বি. এন. এস যাদব, কে. এম. শ্রীমালি প্রমুখ তাঁর বক্ত(্যবের সঙ্গে একমত হলেও অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবন্স মুখিয়া প্রমুখ তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অধ্যাপক সরকার প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতে ভূস্বামী এবং জমিতে ভাড়াটিয়া সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের তাম্রশাসনাদি বি(-ষণ করে (Landlordism and Tenancy in Ancient and Mediaeval India as Revealed by Epigraphical Records) বলেছেন, পুরোহিত ও মঠ মন্দিরকে যে জমি দান করা হত, তা ছিল অপ্রহত ও খিল(ত্র অর্থাৎ অকর্ষিত পতিত জমি। এই জাতীয় জমি উদারহস্তে দান করার ফলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, গ্রামবসতির বিস্তার ঘটেছিল। যে-সব অকর্ষিত পতিত জমি সাধারণত দান করা হত (*অপ্রদ, অপ্রহত* বা *খিল*) তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি ছিল ((ত্র বা বাপ(ত্র (অর্থাৎ যে জমি ছিল কর্ষণযোগ্য, উর্বরা এবং সহজেই বীজবপনীয়) **ফা হিয়েন** - এর উক্তি(থেকে জানা যায় মন্দির নির্মাণের সময় রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায় জমি, বাড়ি, বাগান এবং চাষের জন্য লোক ও বলদ দান করতেন। এর থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, যে-সব জমি গুপ্তযুগে দান করা হত তা অকর্ষিত ছিল বলেই কৃষিশ্রমিক ও বলদের প্রয়োজন হত। ফা-হিয়েন আরও বলেছেন ঃ- যারা রাজার জমি চাষ করে, তারা উৎপাদনের একাংশ প্রদান করে। যারা যেতে চায় তারা জমি ছেড়ে চলে যেতে পারে, যারা থাকতে চায় তারা থাকতে পারে। সুতরাং গুপ্তযুগে যে নতুন জমিদার

শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তারা কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করতে পারত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কয়েকটি বাকাটক তাম্রশাসনে গ্রামে রাজার সেনাবাহিনীর আগমন উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা সৈন্যদের আহার্যের যোগান দিত বলে পরোক্ষ উল্লেখ আছে। কিন্তু এর থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা চলে না যে রাজকর্মচারীদের বা সৈন্য সামন্তদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূখন্ড দান করা হত। কারণ, ফা-হিয়েন থেকে আমরা জানি রাজার দেহরক্ষী ও অন্যান্য সাহায্যকারী সকলেই বেতন লাভ করত।

প্রাচীন ভারতে রাজা তাঁর রাজস্বের জন্য প্রধানত নির্ভর করতেন ভূমি-রাজস্বের উপর। দানগ্রহীতাদের রাজস্ব থেকে মুক্তিদানের পরেও রাজার কয়েকটি অধিকার বজায় থাকত, — যেমন প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং খনি ও বনাঞ্চলের ওপর একচেটিয়া অধিকার। গুপ্ত লেখমালা থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে জমি দান করা হত 'নীবিধর্ম অনুসারে'। দান গ্রহীতার জমি ভোগ দখলের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু হস্তান্তরের অধিকার ছিল না। ইউরোপে প্রাচীন যুগে দাসপ্রথা এবং মধ্য যুগে ভূমিসাদ প্রথাকে ভিত্তি করে যেভাবে দাস-অর্থনীতি ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তা হয়নি। হ'লে, অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে দাসদের মুক্তির জন্য উদার বিধিনিয়ম করা হত না। এ দেশে কৃষকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ অথবা দরিদ্র হলেও কখনই ভূমিদাসে পরিণত হয় নি। শূদ্রমাত্রেই দাস ছিল, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। হরবন্স মুখিয়ার মতে মধ্যযুগে ভারতে কৃষক উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। ফলে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ইউরোপের মতো আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক এখানে গড়ে ওঠেনি।

গুপ্তযুগে নগর সভ্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনবতি ঘটেছিল, এমন সিদ্ধান্ত তর্কের সম্মুখীন হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অগ্রহারগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায়, এক একটি অগ্রহার কৃষি ও কারিগরী শিল্পের ভিত্তিতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল, তথাপি সেই সূত্র ধরে অনুমান করা চলে না যে, সমগ্র দেশে গ্রামগুলিতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনগুলিতে শ্রেষ্ঠী (মহাজন), স্বার্থবাহ (ব্যবসায়ী) এবং কুলিকে (কারিগর-শিল্পী) শব্দগুলি বারবার চোখে পড়ে। তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃত। বিহারে প্রাপ্ত সীলগুলি থেকে জানা যায় এদের নিগম বা গিল্ডের কথা। এই সীলগুলির প্রাপ্তিস্থান বৈশালীতে যে অন্তর্দেশীয় একটি কেন্দ্র ছিল, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় সে-যুগে তাম্রলিপ্ত ছিল একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বন্দর। **রোমিলা থাপার** মনে করেন রাজনৈতিক (মতা বিন্যাস পরিবর্তনর সঙ্গে সঙ্গে অলোচ্য পর্বে নতুন বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। পাটলিপুত্র পূর্বের গৌরব হারায়। কনৌজ তার স্থান গ্রহণ করে। মৌখালিদের শাসন কেন্দ্র ছিল থানেশ্বর। মথুরা এবং কাশী বস্ত্রবিপণনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

খ্রিস্টিয় ৬০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত উত্তর ভারতে মুদ্রার অনুপস্থিতি বা স্বল্পতর ব্যবহারের ধারণা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি। গুপ্ত বংশের শাসকরা অধিক পরিমাণে রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন বেশি এবং সেই তুলনায় তাঁদের তাম্রমুদ্রার পরিমাণ ছিল কম। অথচ দৈনন্দিন কেনাবেচায় রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে তাম্রমুদ্রার চল অনেক বেশি। ফা-হিয়েন বলেন গ্রামের মানুষেরা হাটে-বাজারে কেনাবেচা করতে আসত। ছোটখাট বেচাকেনার জন্য কড়ি ব্যবহার হত। প্রাচীন বাংলায় কড়ি পাওয়া যেত না। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে **মা-হুয়ান চীনা** ভাষায় লিখিত বৃত্তান্তে বলেন,— বাংলা থেকে চাল রপ্তানী হত মালদ্বীপে, পরিবর্তে সে দেশ থেকে কড়ি আসত বাংলায়। এর থেকে বাংলার বহির্বাণিজ্যের কিছুটা আভাস মেলে। তবে প্রশ্ন ওঠে, বৃহৎ অঙ্কের বাণিজ্যিক লেনদেনে যে বিপুল পরিমাণ কড়ির প্রয়োজন হওয়ার কথা, তা বণিকরা বহন করতেন কিভাবে? এই প্রসঙ্গে

দ্বাদশ শতকের শেষ ত্রয়োদশ শতকের শু(থেকে বিনিময় মাধ্যমে হিসাবে লেখমালায় নতুন একটি শব্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *''চুর্ণী''*। মনে হয়, এর দ্বারা ধাতব চূর্ণকে বোঝান হত। দ(িণ-পূর্ব বাংলায় ময়নামতীতে উৎখননের ফলে আদিমধ্যযুগীয় পূর্বে রৌপ মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এইসব রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার ছিল। **নোবু(কারাশিমা** প্রমাণ করতে চেয়েছেন চোল রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে পদস্থ অধিকারিকগণ লুণ্ঠনের মারফৎ প্রচুর সম্পদ আহরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এর সাহায্যে তারা প্রচুর ভূসম্পত্তি ত্র(য় করেন। অগ্রহার সৃষ্টির স্বার্থে তার কৃষিজীবী প্রজাদের উৎখাত করেন। এ(ে ত্রে জমির বৃহৎ মালিকানা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক ছাড়াই গড়ে ওঠে।

গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করেন না **রোমিলা থাপার।** খননকার্যের ফলে যেসব প্রত্ন অবশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে তামা ও লোহার বহু নিদর্শন চোখে পড়ে। গৃহস্থালির জন্য নল যুক্ত(পাত্র (Spouted pottery) লোকে ব্যবহার করত। **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** আবার দুটি কারণে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব বলে মনে করেন। *কামসূত্র* (চতুর্থ শতক) উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন গ্রাম সমাজ স্তর বিভক্ত(ছিল। *মিলিন্দপহ্ন* গ্রন্থে বৌদ্ধ প্রচারক নাগসেন রাজা মিলিন্দকে এক জায়গায় বলেন, গৃহস্বামীরা কেবল গ্রামবাসী— অন্যদের যেমন ত্রীতদাস বা পরিচালকদের তিনি ধর্তব্য জ্ঞান করেন না। অধ্যাপক ইরফান হাবিব বলেন— This is good evidence of what Kosambi terms feudalism from below, although he would place its period much later. (Interpreting Indian History)। অন্য যে কারণের প্রতি অধ্যাপক হাবিব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অষ্টম শতকের শু(তেই অ(ারোহী সেনার আবির্ভাব। সপ্তম শতকের মধ্যেই যুদ্ধ(ে ত্রে রথের ব্যবহার অবলুপ্ত হয়ে এসেছিল। উত্তর ভারত এবং দা(িণাত্যের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে অ(ারোহীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শাসন করা সম্ভবপর ছিল। হাবিব একে বলেছেন (a kind of ''Feudalism from above'')।

ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। বর্তমানেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এর রেশ দেখতে পাই। অধ্যাপক ব(ণ দে বলেছেন, 'আমরা যদি ওড়িষ্যায় যাই এখনও দেখব যে, যে অঞ্চলটা ছিল মুঘল বন্দি এবং পরে ব্রিটিশদের অধীনে এলো সেখানে আধুনিকতা অনেক আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। যে অঞ্চলকে মুঘলরা বলত গড়জাত বা নানা গড়ের সমষ্টি, সেখানে এখনও সামাজিক সামন্ততন্ত্র জোরদার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে যেখানে প্রচুর সামন্ততান্ত্রিক খুদে রাষ্ট্র ছিল সেখানে আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চল এখনও প্রচুর আছে। আজকের দিনে নেহে(বংশজাত প্রধানমন্ত্রীর বি(দ্ধে কোন বিকল্প খাড়া করার কথা যারা ভাবেন তাঁরা কোন ছোট ঠাকুরকে রাজা সাহেব বলে অভিহিত করেন। তারপর বিকল্প বলে ধরে নিতে আহ্বান করেন। এর চেয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? এরই মধ্যে আস্তে আস্তে ধনতন্ত্রের প্রবর্তন আমরা দেখতে পাই। (''ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ত্র(ম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্য'', গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান* ৩)

১২.২ আঠার শতকের ভারত

১৭০৭ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সূর্য অস্তমিত হয়। সমগ্র ভারত জুড়ে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিরতা দেখা দেয়। অভিজাত গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র ও পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়। নাদির শাহ এবং আহমদ শাহ আবদালীর আত্র(মণে একদা বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

১৭৪০ খ্রিঃ- এর পর মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও মোগল সম্রাট তখনও আইনত ছিলেন ভারতের অধী(ের। কিন্তু মোগল সম্রাটের পদের ঐতিহ্য বা সম্মান অ(ুন্ন ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে সুবাদাররা কার্যত নিজেদের অঞ্চলে (মতা প্রতিষ্ঠা করে মোগল সম্রাটের প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক আনুগত্য দেখায়। মারাঠা শক্তি(ের আর্বিভাবে মনে হয়েছিল তার মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তারাই হবে। কিন্তু ১৭৬১ খ্রিঃ- এর পাণিপথের যুদ্ধের পর সে স্বপ্ন বিলীন হয়। এই সুযোগে পূর্ব ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আধিপত্য বিস্তার করে। ইংরেজদের দাবি ছিল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের হাত থেকে তারা ভারতবর্ষকে র(া করেছে। আঠার শতকের ভারতের ইতিহাস তাদের মতে ঘোর কালিমাচ্ছন্ন। এই ধারণাই দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়েছে। **আচার্য যদুনাথ সরকার** সম্পাদিত *History of Bengal* গ্রন্থের মধ্যযুগের পর্ব শেষ হয় পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সামরিক সাফল্যের বর্ণনায়। ঐ সময় থেকেই তাঁর মতে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ পার হয়ে আমরা আধুনিক কালে পৌঁছলাম। (''On 23rd June, 1757 the middle ages of India ended and her modern age began'')। সতের শতকে যে অভিজাত গোষ্ঠী মোগল সাম্রাজ্য গঠনে গু(ত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করেছিল, উত্তরসূরীরা তার ঐতিহ্য র(ায় ব্যর্থ হল। প্রশাসন দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়, সমাজ নৈতিকতা তলানিতে ঠেকে (''hopelessly decadent soceity'')। এই একই কথা তাঁর আগে বলেছিলেন ঐতিহাসিক **হার্মান গোয়েৎজ (Harmann Goetz,** *Crisis of Indian Civilization in the Eighteenth and early Nineteenth Centuries)*।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে **অধ্যাপক ইরফান হাবিব** তাঁর *ঘুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭) গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর একই রকম মসীময় চিত্র এঁকেছেন। তিনি মনে করেন,— ''এর পরের পর্বটি যে- দৃশ্যটি উপস্থাপিত করে তার থেকে শেখার কিছুই নেই। লাগামহীন লুঠতরাজ, বিশৃঙ্খলা আর বিদেশি আত্র(মণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল।'' মারাঠা আত্র(মণের ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্য কতখানি (তিগ্রস্ত হয়েছিল তার আলোচনা করেছেন অধ্যাপক **অশীন দাশগুপ্ত** *(Indian Merchants and the Decline of Surat)*। সুরাট বন্দরের শাসকরা ঘটনার পরিণাম বণিকদের কাছ থেকে অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সুরাটের বণিকদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। অটোমান এবং সাফাভি রাজবংশের পতন ঘটে। ইয়েমেনের গৃহবিবাদে বিভিন্ন দল এবং উপদলের টাকার খাঁই গুজরাটি বানিয়াদের মেটাতে হয়। মোখা, জেদ্দা ও বসরার বাজার (তিগ্রস্ত হওয়ার পরিণামে তাদের সংকট বৃদ্ধি পায়।

সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করলে আঠার শতকের পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যজনক এবং বিশৃঙ্খলা বলে বর্ণনা করা উচিত কিনা সে-সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন ইদানীং কিছু ঐতিহাসিক। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র তাঁর *Parties and Politics in the Mughal Court, 1707-1740* গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক দশক মোগল ইতিহাস অলোচনা করে দেখিয়েছিন অভিজাতবর্গের মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তি(ত্বের অভাব ছিল না, — যেমন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, দা(িণাত্যের নিজাম-উল-মুলক এবং বাংলায় মুর্শিদকুলী খান। কিন্তু প্রতিভার সম্যক ব্যবহার সম্ভব ছিল না। সতীশ চন্দ্র পরবর্তীকালে আঠার শতকের ভারত প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা ভাঙনের চিত্র অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। নাদির শাহ এবং আহমদ শাহ্ আবদালীর আত্র(মণের পরও দিল্লি সম্পূর্ণ হতশ্রী হয়ে পড়েনি। ১৭৮০ সালে *মাসির-উল-উমারা* গ্রন্থের লেখক শা'নওয়াজ খান বলেন নাদির শাহের আত্র(মণে যে (তি হয়েছিল দিল্লি তা অচিরেই কাটিয়ে ওঠে। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আমোদ প্রমোদানুষ্ঠান সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বাদ পড়েনি। সতীশ চন্দ্রের মতে শাসকবর্গ বাণিজ্যিক লাভ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, অযোধ্যার নবাব সদত খান শুল্কের হার কমিয়ে বাণিজ্যের সুবিধা করে

দিয়েছিলেন। মীর, সৌদা প্রমুখ উর্দু ভাষার কবিরা পৃষ্ঠপোষকদের ভাগ্য বিপর্যয়ে কাতর হলেও উল্লেখ করতে ভোলেন না সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষরা সামনের সারিতে চলে এসেছে। সমাজে পরিবর্তন এসেছিল এর থেকে বেঝা যায়। লাহোর, দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি শহরের জৌলুস ম্লান হয়ে এলেও বিলাস পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল মনে করার কারণ নেই, যেহেতু অভিজাতবর্গ দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল।

আঠার শতকে ভারতীয় বণিকদের অব(য়ের প্র(টি সমগ্র দেশের পরিপ্রে(তে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন আছে। একথা ঠিক যে উপকূলের সঙ্গে পশ্চাদভূমির যোগাযোগ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই শতকে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু সুরাট শহরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করার অসুবিধা আছে। এই বন্দর শহরের বিকাশ হয়েছিল একান্তই বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে। যা ল(ণীয় তা হল, এখানকার অধিবাসীরা শহর সুর(ত করার দায়িত্ব দীর্ঘকাল নিতে চায়নি। ব্যক্তি(গত লাভ-লোকসান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ফলে তারা সহজেই শত্রুর শিকার হয়। সুরাটের সঙ্গে গুজরাটের অন্যান্য শহরের (যেমন আমেদাবাদ) পার্থক্য এই ((ত্রে সহজেই চোখে পড়ে। সুরাটের বস্ত্র ব্যবসায়ের পতন যতখানি দ্রুতগতি বলে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত বর্ণনা করেন, তা বাস্তব অবস্থার কতখানি সঠিক প্রতিফলন সে সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার বাজারে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা অপে(াকৃত ধীর গতিতে হ্রাস পাচ্ছে ১৭৪০ পর্যন্ত ইংরেজরা বাংলায় কাপড় নিয়ে ঐসব অঞ্চলে ব্যবসা করেছেন। উপরন্তু ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এই সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় হ্রাস পেলেও কফির বাজার তেজী ছিল। আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে গায়কোয়াড় বংশ গুজরাটে শান্তি ফিরিয়ে আনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব তাই সুরাটের পতনের অন্যতম কারণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে আমাদের সংশয় থেকেই যায়, বিশেষত যখন মনে রাখি যে সমুদ্র বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক সমাজের অভ্যন্তরীণ খুটিনাটি অশীন দাশগুপ্তের বি(-ষণ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রাথমিক স্তরে নিযুক্ত(ভারতীয় উৎপাদকদের চলিষু(তা এবং উৎপাদন পুনর্বিনস্ত্য করার (মতাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বর্গী আত্র(মণে বাংলার অর্থনীতির অত্যন্ত (তি হয়েছিল বলে মনে করা অনুচিত হবে— বলেছেন **অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী।** হলওয়েল, বোল্টস প্রমুখ সমকালীন পর্যবে(কদের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় কুঠিয়ালদের হিসাবপত্র থেকে বোঝা যায় বাংলার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রাক্-পলাশী পর্বে মোটের ওপর প্রচলিত ধারায় চলেছিল। আসল আঘাত আসে কোম্পানির শাসনকালে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পাশাপাশি নতুন আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন আঠার শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাঙনের চিত্র আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণ আকর্ষণ করায় নতুন শক্তি(বিন্যাসের প্রতি দীর্ঘকাল আমরা যথেষ্ট দৃষ্টি দিইনি। কৃষি ব্যবস্থায় যে ভয়াবহ সংকটের চিত্র ইরফান হাবিব এঁকেছেন, তার বিস্তার ভারতব্যাপী ছিল কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্র(ো করতে ছাড়েননি। *Cambridge Economic History of India* গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বলা হয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে নতুন জমি সম্ভবত চাষের অধীনে আনা হয়। ভাঙন নয়, ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উপরোক্ত(গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের চাপ বলে অধ্যাপক হবিব যার উল্লেখ করেছেন, আঠার শতকের প্রথমার্ধে তা পরিমাপ করার সময় মনে রাখতে হবে কৃষি পণ্যের দাম প্রায় দিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর তা মোটামুটি স্থিতিশীল হয়, এমনকি তা হ্রাস পেতে থাকে (Cambridge Economic History of India, Vol. II 26). দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে মত শহরগুলি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে (তিগ্রস্থ হলেও ফৈজাবাদ, ল(ৌ, বেনারস, পাটনা প্রভৃতি শহরের বিকাশ ঘটে। নতুন যে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল, সেগুলির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৭২৪ খ্রীঃ স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজাম-উল-মুলক। তাঁর বিচ(ণতার প্রশংসা করেছেন সমসাময়িক ব্যক্তি(কাফি খাঁ। নিজাম-উল-মূলক প্রতাপশালী জমিদারদের এবং শক্তি(শালী মারাঠাদের বদান্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন।

১৭২২ খ্রিঃ সাদাত খাঁ অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত(হন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এ্বং মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলেন। বিদ্রোহী জমিদারদের সাধারণভাবে নিজেদের এলাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ বশ মানানো যায়নি। সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করত। ১৭২৩ খ্রিঃ তিনি নতুন করে তাঁর রাজ্যে রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন। ফলে জমিদারদের নিগ্রহ থেকে কৃষকদের অনেকখানি র(া করা সম্ভব হয়। ১৭৩৯ খ্রিঃ তার মৃত্যুর পূর্বে অযোধ্যা কার্যত একটি স্বাধীন রাজ্যের রূপ নেয়। সাদাত খাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল উপযুক্ত(প্রশি(ণপ্রাপ্ত এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত। সৈনিকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তাঁর উত্তরসূরী সফদর জঙের রাজত্বকালে এলাহাবাদ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত(হয়। লক্নৌ সংস্কৃতি ও শিল্পের বিকাশে এক গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৭৪ খ্রি পর তা রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সফদরজঙ অচিরেই খ্যাতিলাভ করেন। অযোধ্যার বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন তিনি। তাঁর নৈতিকতার মান ছিল প্রশংসনীয়। প্রশঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজাম ও বাংলায় মুর্শিদকুলী ছিলেন একই রকম নৈকিকতার অধিকারী। আঠার শতরেক মোগল অভিজাতবর্গ সম্পর্কে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার যে অভিযোগ সাধারণত করা হয় তা তাদের (ে(ত্রে প্রযোজ্য নয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় মুর্শিদকুলীর শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর সুদ(শাসনে বাংলা দেশে রাজনৈতিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত(করে গতিশীল করে তোলেন। তিনি কঠোর হাতে বিদ্রোহী জমিদার সীতারাম রায়, উদয়নারায়ন, গোলাম মহম্মদ, সুজাত খাঁ ও নাজাত খাঁকে দমন করেন। বাংলার ভূমি রাজস্ব সংস্কারের (ে(ত্রে তিনি পথ নির্দেশ করেন। রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপাদিকা শক্তি(র অনুপাতে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। রাজস্ব বিভাগের অধিকাংশ পদে মুর্শিদকুলী হিন্দু কর্মচারীদের প্রাধান্য দেন। ঐতিহাসিক **সলিম উল্লাহ**- এর *তারিখ-ই-বাংলা* গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ মেলে। মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা ও ন্যায়পরায়ণতার তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বাণিজ্যিক বিকাশের দিকেও তার ল(্য ছিল।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে জাঠরা বিদ্রোহ করে। দিল্লী, আগ্রা এবং মথুরার সন্নিকট অঞ্চলে কৃষিজীবী হিসাবে তারা জীবনধারণ করত। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও জাঠ শক্তি(কে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। বদন সিং সুরজমলের নেতৃত্বে নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। ভরতপুর রাজ্যে তারা সংগঠিত হয়। ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রিঃ তাদের চরম বিকাশ ঘটে। সুরজমল ছিলেন অতি দ(সৈন এবং প্রশাসক। পূর্বে গঙ্গা থেকে পশ্চিমে আগ্রা এবং উত্তরে দিল্লি থেকে দ(িণে চম্বল পর্যন্ত তাঁর (মতা বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জাঠ শক্তি(র পতন ঘটে।

মোগলদের বি(দ্ধে শিক শক্তি(সংগঠনে নেতৃত্ব দেন শিখদের শেষ গু(— গোবিন্দ সিং (১৬৬৪-১৭০৮)। তাঁর মৃত্যুর পর বান্দাবাহাদুর নতুন ভাবে লড়াই শু(করেন। ১৭১৫ সালে তিনি মোগল সৈন্যের হাতে বন্দি হন। তাঁকে হত্যা করা হয়। শিখরা ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পায় বহিঃশত্রুর আত্র(মণে পাঞ্জাবে মোগল শাসন ব্যবস্থার বিপর্যয়ে। শিখ ইতিহাসের এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিসল সংগঠন। মিসলগুলি ছিল সমতাভিত্তিক। তারা নিজেদের নেতা নিজেরা নির্বাচন করে। মিসল গুলি সংখ্যায় ছিল ১২। দুর্ভাগ্যবশত তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র ত্র(মে অন্তর্হিত হয়। তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শিখ শক্তি(র বিকাশে অন্যতম বাধার সৃষ্টি করে।

মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী হিসাবে পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠাদের নিজেদের দাবী পেশ করেছিল। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ডাক দেন। উত্তর ভারতে মারাঠাদের অভিযান

১৮৬১ সালে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ্ শাহ আবদালীর হাতে পরাজয়ের পর কিছুকাল বাধা প্রাপ্ত হয়। পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে (১৭৬১-১৭৭২) মারাঠা শক্তি(র পুন(থানের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, পেশোয়ার অকাল মৃত্যুতে তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বিভিন্ন মারাঠা পরিবার যেমন গায়কোয়াড় হোলকার, সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের শক্তি(সংগঠিত করে। উত্তর ভারতে মহাদজী সিন্ধিয়া নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত মারাঠারা নিজেদের শক্তি(অ(ুন্ন রাখে।

দ(িণ ভারতে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহীশূর রাজ্য হায়দর আলী এবং টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিশেষ শক্তি(শালী হয়। টিপু বিপ-বী ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর প্রতিনিধিরা তুরস্ক, ফ্রান্স এবং অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে দেশ থেকে ইংরজেদের বিতাড়নের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। তার রাজ্যে সাধারণ প্রজার সন্তুষ্ট ছিল। কৃষিকার্য ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ১৭৯৯ খ্রিঃ ইংরেজদের বি(দ্ধে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। টিপু ছিলেন উদার প্রকৃতির শাসক। মারাঠারা শৃঙ্গেরী মঠের (তিসাধন করলে তিনি তা পূরণ করেন। তার রাজপ্রাসাদের অদূরেই ছিল শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির।

সাংস্কৃতিক (ে(ত্রে আঠার শতক বৈশিষ্ট্য বর্জিত ছিল না। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ নীতি তাঁর উত্তরসূরীরা অবলম্বন করেননি। যোধপুর ও জয়পুরের শাসকেরা মোগল রাজনীতিতে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে হিন্দুরা প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত(হয়েছিল। হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজামের দেওয়ান ছিলেন পূরণচাঁদ। মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দুদের রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত(করেছিলেন। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে স্থানীয় ভাষা বিকাশ লাভ করেছিল। অহম্ রাজারা অসমিয়া ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ওয়ারিশ শাহ পাঞ্জাবী ভাষায় স্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন। কেরলে মালয়ালম্ ভাষার প্রভূত বিকাশ ঘটে। কাঙ্গারা ও রাজপুত চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ল(্য করা যায়। স্থাপত্যের দিক থেকে দেখা যায় ল(্ণৌর ইমামবাড়া এযুগের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি। অম্বরের রাজা সোয়াই জয়সিং (১৬৮১-১৭৪৩) জয়পুরে যে শহর গড়ে তুলেছিলেন তা ত্র(মে বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বেনারস এবং মুথরায় সৌর পর্যবে(ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সমস্ত দিক বিচার করলে আঠার শতকের ভারতকে কেবলমাত্র নৈরাজ্য ও অব(য়ের যুগ বলা যায় না।

১২.৩ অনুশীলনী

১) আঠার শতকের ভারত প্রসঙ্গে একটি টীকা লিখুন।

২) ভারতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে একটি রচনা লিখুন।

১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

রণবীর চত্র(বর্তী— প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।

ব(ণ দে—''ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ত্র(ম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্য'', গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ৩